বাংলা সাহিত্যের নরনারী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্রিয়বরেষু

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ রচনা 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' নামে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রাধা' বঙ্গশ্রী পত্রিকায়, 'শ্রীকান্ত' ও 'রতন' শরৎ-স্মরণিকায় এবং 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' ও 'মোহিনী' আনন্দবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

সূচিপত্র

সূচনা

ইতিপূর্বে ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মনীষীদের চিত্র-চরিত্র লিখিয়াছি। তাঁহারা ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ। জীবলোক হইতে অপসারণের পরে স্মৃতিরূপে মাত্র তাঁহারা বিরাজিত। সেই স্মৃতিকে পুনরায় রক্তমাংসের সংস্কারে ভূষিত করাই ছিল 'চিত্র-চরিত্র'-লেখকের উদ্দেশ্য। এবারে অন্য-এক প্রকার চিত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহারা বাংলার মনীষী নয়, বাংলার মনীষীদের সৃষ্টি। সাধারণ অর্থে ইহারা রক্তমাংসের জীব না হইয়াও রক্তমাংসের জীবের চেয়েও অধিকতর সত্য, যে-সব মনীষীর ইহারা সৃষ্টি, তাঁহাদের চেয়েও ইহাদের আয়ু দীর্ঘতর, ইহাদের অনেকেই অমর, মৃত্যুশীল মানুষের অমরতার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। মানুষ মরিতে চায় না, কিন্তু তাহার চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা কেবল সন্তান-ধারার মধ্যেই রূপান্তরে সার্থক হইতে পারে। আর হইতে পারে সার্থক শিল্পসৃষ্টির কল্যাণে। শিল্প অমরতার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর-কিছুই নয়। মানুষ অমর হইলে শিল্পসৃষ্টি করিত না। দেবতারা শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করে না।

বাংলা সাহিত্যের নরনারীর চিত্র লিখিতে যাইতেছি। বাঙালির শিল্পসৃষ্টির আয়তন সামান্য নয়। হাজার বছরের পুরাতন বৌদ্ধ গান ও দোঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃতি বড়ো অল্প দিনের নহে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাঙালি লেখকগণ যে-সব নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা অগণিত। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে শুরু করিয়া আধুনিকতম সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাস পর্যন্ত কত বিচিত্র চরিত্রেরই না সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর আজকের লেখা কাব্যে কথায় পার্থক্য যতই প্রকট হোক সখীগণ-সহ শ্রীরাধা আর নূতনতম চরিত্র-কল্পনা উভয়ই বাঙালির ঘরের লোক, তাহার পরিচিত আপনজন। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর ভাঁড়ু দত্ত এবং আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচা— উভয়ের মধ্যে ভেদ কেবল সাময়িক, দু-জনেই বাংলার মাটিতে গড়া। বস্তুত, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সৃষ্ট হইলে একপ্রকার বাহ্য প্রভেদ দেখা দিবেই, কিন্তু অন্তর্লোকে মিল থাকিয়া যায়। বংশধারার ইতিহাসে ঐ অমিলের মধ্যে মিল খুঁজিয়া বাহির করা বৈজ্ঞানিকের কাজ, সাহিত্যের ইতিহাসে সেই কাজ সমালোচকের। বাঙালি লেখকের সৃষ্ট

কতকগুলি বিশিষ্ট (সবগুলি সম্ভব নয়) নরনারীর ইতিহাস রচনাই বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যের নরনারীকে রক্তমাংসের জীব বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়া কাজে নামিতে হইবে। কিন্তু 'কল্পনা' শব্দটাতে কেহ-কেহ আপত্তি করিতে পারেন। বস্তুতই ইহারা রক্তমাংসের জীব। রক্তমাংসের জীব বলিতে যদি জীবন্ত বোঝায় আপাদমস্তক প্রাণপ্রবাহে স্পন্দিত বোঝায়, তবে ইহারা বাস্তব নরনারীর চেয়েও অনেক বেশি জীবিত! ইহারা এতই বেশি জীবিত যে ইহাদের মৃত্যু নাই, এমনকি ইহাদের জন্মই হয় নাই, ইহারা স্বয়ম্ভূ! বাল্মীকির চেয়ে রাম অনেক বেশি সজীব, ব্যাসের চেয়ে অনেক বেশি সজীব যুধিষ্ঠির। সত্য কথা বলিতে কি, এখন বাল্মীকি ও ব্যাস রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের সুবাদেই পরিচিত। রামের জন্মের আগে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল— এই প্রবাদের চেয়ে অনেক বেশি সত্য রামচন্দ্র বাল্মীকিকে *সৃষ্টি* করিয়াছেন। *সৃষ্টি* অর্থে যদি জ্ঞানগোচরতা বোঝায় তবে রামের কৃপাতেই কি বাল্মীকির চৈতন্য আমাদের হয় নাই? রামায়ণ না থাকিলে আজ বাল্মীকিকে কেহ জানিত কি?

সমাজেব হিসাব-রক্ষকেরা বলিতেছেন যে, বাংলার লোকসংখ্যা এত দ্রুত বাড়িতেছে যে খাদ্যের ঘাটতি বাড়িয়াই চলিবে। এ-সব কথা কতদূর সত্য, আর কতদূর রাজনীতি, জানি না। কিন্তু জানি যে, বাংলা সাহিত্যের নরনারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, আরও জানি যে তাহারা কখনো খাদ্যে ঘাটতি ঘটাইবে না। ইহারাই বাঙালির ভাবলোকের অধিবাসী, ইহাদের বাসস্থানই বাংলার ভাবলোক। শিল্পসৃষ্টির আদিযুগ হইতে প্রত্যেক দেশে এইরূপ এক-একটি ভাবলোক গড়িয়া উঠিতেছে। শিল্পসৃষ্টির সক্ষম যুগের আগে হইতেই এইরূপ ভাবলোক গড়িবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে ছিল। আকাশে গ্রহতারা ফোটে, কিন্তু সেগুলিকে বৃহস্পতি, শুক্র বা সপ্তর্ষি কল্পনা করিবার কারণ কী? যে-সব মনীষী এক সময়ে ধরাতলে বিচরণ করিতেন, মৃত্যুর পরে তাঁহারা তারায় রূপান্তরিত হইয়াছেন—

They will suffer a star-change into something
rich and strange.

মানুষের স্বর্গলোকের অধিবাসীর সংখ্যাও এই একই ভাবে, এই একই আকাঙ্ক্ষা হইতে দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে— এখনো বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বর্গের দেবতার সংখ্যা

প্রাচীনকালে নিশ্চয় তেত্রিশ কোটি ছিল না, দূর ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কি গ্রহ নক্ষত্রলোকে কি স্বর্গলোকে নিরন্তর একটা **sublimation** বা উর্ধ্বায়ন-প্রক্রিয়া চলিতেছে। সেই প্রক্রিয়ার ফলেই প্রকৃতি শিল্পে পরিণত হইতেছে— অর্থাৎ প্রাকৃত অপ্রাকৃত হইয়া উঠিতেছে। এই প্রক্রিয়া হইতেই সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্যের নরনারীর সৃষ্টি।

এক হিসাবে বর্তমান পর্যায় 'চিত্র-চরিত্র' হইতে ভিন্নপন্থী রচনা। চিত্র-চরিত্রে ছিল রক্তমাংসের জীবকে ভাবলোকে উর্ধ্বায়ন, আর এখন করিতে চাই ভাব-লোকের জীবকে রক্তমাংসের সংসারে নিম্নায়ন। এ অনেকটা স্বর্গ হইতে বিদায়ের অনুরূপ। ভাবস্বর্গের জীবকে বাস্তব সংসারে নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে চাই কী প্রতিক্রিয়া ঘটে। বর্তমান পর্যায়ের ভাব হইতে রূপে আসা, আবার পূর্বতন পর্যায়ের রূপ হইতে ভাবে যাওয়া— এই দুইয়ে মিলিয়া 'ভাব হতে রূপে' যাতায়াতের চক্রাবর্ত সম্পূর্ণ হইবে। এইরূপে বাংলার মনীষার বাস্তব রূপ ও ভাবরূপ— দুইকেই হয়তো জানিতে পারা যাইবে। বাঙালির ভাবলোকের এই অধিবাসীগণ বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়তো এমন সংবাদ দিতে পারিবে রাজনীতির শুষ্ক দলিলে যাহার আভাসটুকুও মর্মায়িত হয় না।

বাংলাদেশ নিজেকে বদ্বীপমালায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া আত্মবিস্তার করিতেছে, সমুদ্রগর্ভের রহস্য দিবালোকের বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। বাঙালি শিল্পের অন্তরের রহস্যলোক হইতে তেমনি নিত্য-নব নরনারী বাঙালির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাদের লইয়াই সত্যকার বাঙালিসমাজ, কারণ ইহারা চিরন্তন। বাস্তব নরনারী বিশেষ কাল অধিকার করিয়া বিরাজ করে, কিন্তু যাহারা ভাবৈকরূপ, বিশেষ কালের দ্বারা তাহাদের আয়ু পরিমিত নহে বলিয়াই তাহাদের কাছে চিরন্তনের সংবাদ পাইবার আশা। সঠিক সংবাদের জন্য লোকে স্বর্গ-মর্ত খুঁজিয়া দেখে, বাংলার স্বরূপ জানিবার আশায় আমরা এই চিরায়ু নরনারীর দ্বারস্থ হই না কেন? ইহাদের ছাড়িলে বাংলাদেশ অসম্পূর্ণ, বাঙালিসমাজ খণ্ডিত। বাস্তব বাঙালি ও ভাবময় বাঙালি মিলিয়াই বাঙালির স্বরূপ। স্বরূপ মানে সমগ্র রূপ। বাংলাদেশের সত্যকার ইতিহাস যিনি লিখিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ইহাদের জীবনচরিত লিখিতে হইবে। বাস্তব নরনারী সংবাদ মাত্র দিতে পারে, সত্যের সোনার কাঠি এই ভাবৈকরূপ নরনারীর আয়ত্তে।

রাধা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা দুরূহ, অন্তত আংশিকভাবে দুরূহ— পণ্ডিতেও স্বীকার করিয়া থাকেন ; ভাবাংশও অল্পবিস্তর অশ্লীল— রসিকেও অস্বীকার করেন না। এখন, এই উভয় বিপদ পাশ কাটাইয়া সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য কিছু পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।

আদিরসের দুস্তর সমুদ্র এবং দুরূহ ভাষার প্রাকারের পারে একটি তরুণী এই কাব্যে অপেক্ষা করিতেছে। রসবোধের সোনার কাঠির স্পর্শে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অথবা, কবিই স্বয়ং সে-কাজটুকু সারিয়া রাখিয়াছেন। কারণ এই কাব্য রাধার বাল্য হইতে যৌবনোন্মেষে জাগরণের কাব্য।

পদাবলীতে যে-রাধার সহিত আমরা পরিচিত এ সে নহে। পদাবলীর রাধা যৌবনের প্রথম অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত। প্রেমের প্রথম বিস্ময় তাহার কাটিয়া গিয়াছে! বিদ্যাপতিব রাধা অবশ্য কিশোরী, কিন্তু এ-কাব্যে রাধা একেবারে বালিকা। কবি তাহাকে অত্যন্ত কৌশলে বাল্যের জ্ঞাতপ্রায় জীবন হইতে ধীরে-ধীরে একটির পর একটি অভিজ্ঞতার আঘাতে— ভাস্কর যেমন পাথর হইতে মূর্তি ফুটাইয়া তোলে— কৈশোরের মধ্য দিয়া যৌবনময়ীরূপে গড়িয়া তুলিয়া প্রেমের বিস্ময়-নিকেতনের সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ পদাবলীর তিল-তুলসী-যথার্পিত-দেহ রাধা নহে— ভক্তিরস যাহার উপজীব্য। এ-রাধা দুরন্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা কিশোরী, গর্বিতা যুবতী। কৃষ্ণের দেবত্বে ইহার বিশ্বাস নাই, পরকীয়া প্রেমের মহত্ত্বে এ সন্দিগ্ধা। এ হাসিয়া রাগিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, মারিয়া ধরিয়া, ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া, কথাব মুখে-মুখে তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়া সমস্তক্ষণ পাঠকের মর্মকে টানিয়া রাখে; এবং কাব্যের শেষে বিরহব্যথার নিভৃত খিলান-পথে কখন অজ্ঞাতসারে একেবারে মনের মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ করে। এ-মূর্তি এতই সজীব প্রাণ-প্রচুর যে, মনে হয় তাহার পায়ে কাঁটাটি বিঁধিলে এখনই রক্ত বাহির হইবে। এই রক্তের অধিকারই সাহিত্যের অধিকার ; সে-স্বাভাবিক অধিকারে রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়িকা এবং রাধার অধিকারে কাব্যখানি নানা দোষ সত্ত্বেও অমূল্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও পদাবলীর রাধাকে যথাক্রমে বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ব-রাধা ও উত্তর-রাধা বলা চলিতে পারে। সেকালে আর-দশজন কবি গতানুগতিক পথে কাব্য-রচনা করিতেছিলেন, তখন যে একজন কবি বাঁধা পথ ছাড়িয়া পূর্বরীতিসম্মত একটা পুতুল না গড়িয়া মানুষ গড়িতে পারিলেন ইহাই বিস্ময়ের।

বর্তমান রাধার চরিত্র যে-কয়েকটি মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণামে উপস্থিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাক।

রাধা বড়ায়ির সঙ্গে নিত্য দুধ-দই বেচিতে যায়, একদিন সে পথ-হারাইয়া গেল। বড়ায়ি কৃষ্ণকে রাধার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। কৃষ্ণ চায় তাহার বর্ণনা শুনিতে। বর্ণনা তো জানা চাই নহিলে সন্ধান হয় কেমন করিয়া! কত লোকেই তো যায়। বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ রাধার খোঁজ বলিয়া দিল বটে, কিন্তু নিজেকে হারাইয়া ফেলিল— রাধার প্রেমে। তার পর বড়ায়ির সঙ্গে মন্ত্রণা, তাহাকে দিয়া ফুল প্রেরণ, কিন্তু এ বড়ো শক্ত স্থান। বড়ায়ি মার খাইল, কৃষ্ণ বোধকরি, কাছে ছিল না বলিয়া বাঁচিয়া গেল। পণ্যের মাশুল-আদায়কারী সাজিয়া কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে চলিল, আর রাধা সেখানে যাইতেই তাহাকে ধরিল: তোমার বারো বছরের মাশুল বাকি, দাও। কিন্তু সে কী কথা। তাহার বয়স যে বারোই নহে!

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥

তার পরে উভয়ে কত তর্ক-বিতর্ক! কৃষ্ণ বলেন, তিনি বিষ্ণু ইত্যাদি। কিন্তু যে-দময়ন্তী দেবতার মধ্যে মানুষকে চিনিতে পারিয়াছিল, রাধা তো সেই মেয়েরই জাত। সে কৃষ্ণে দেবতার কোনো চিহ্ন দেখিতে পায় না। দেবতার পক্ষে ইহা আশ্চর্যের, কিন্তু রাধা যে-উত্তর দেয় তাহা প্রায় অপমানের মতোই শোনায়—

শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞি পথত বসিআঁ॥

নিরুত্তর হইয়া কৃষ্ণ পূর্বজন্মের ও ভাবী বীরত্বের কথা তোলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া এ-মেয়েকে ভোলানো কঠিন, তবে হাঁ, সে তাহার বীরত্বের পরীক্ষা পাইয়াছে বটে—

তোহ্মার বিরত কাহ্নাঞি তিরীর উপর।
এতেকেঁ পাইল তোহ্মে মহত্ব বিথর॥

কৃষ্ণ বলেন তিনি নাকি ত্রিদশের ঈশ্বর!

আপণে বোল তোহ্মে ত্রিদশের পতী।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী॥

অবশেষে কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন—রাধার রূপবর্ণনা শুরু করিলেন, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল কিনা জানি না, শ্লেষ তো থামে না!

দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান।

এবার এই অস্ত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত ফল ফলিল। রাধাকৃষ্ণে মিলন হইল বটে, তবে তাহাতে কৃষ্ণের ধৈর্য বেশি কি রাধার প্রেম বেশি বলা শক্ত।

ইহার পরে রাধার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন সে স্বেচ্ছায় আনন্দে মথুরার পথে যাতায়াত করে। শুধু তাই নহে, এখন প্রেম-ব্যাপারে সে বেশ দ্রুত উন্নতি করিতেছে। এখন সে কৃষ্ণকে মিলনের আশা দিয়া ছত্র ধারণ করায় ও দধির ভার গ্রহণ করায়। কিন্তু বৃন্দাবনখণ্ডে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, রাধা কৃষ্ণকে ভালো বাসিয়া ফেলিয়াছে! কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া, পাছে সে অন্য গোপীর সহিত মিলিত হইয়া থাকে ভাবিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করে। ঈর্ষাই প্রেমের প্রমাণ।

এ-সব দেখিয়া এই সেদিন যে তাহার বয়স এগারো ছিল তাহা তো বিশ্বাস হয় না! কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপবর্ণনায় বিশ্বাস করিলে এগারোকে কয়েক বছর উপরে ঠেলিয়া দিতে হয়। তবে রাধা এগারো বলে বটে, কিন্তু তাহার ব্যবহার যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে! কংস-ভীতিই রাধার বয়স কমাইবার কারণ। বিশেষত, কোনো কারণ না থাকিলেও মেয়েরা বয়স কমাইয়া বলে!

রাধা আর অনভিজ্ঞা বালিকা নহে। প্রেমের স্বাদ সে পাইয়াছে, কিন্তু পদাবলীর কোমলতা এখনো সে পায় নাই। কৃষ্ণকে কঠোর বচন শুনাইতে তাহার বাধে না।

বংশীখণ্ডে আসিয়া রাধার প্রেমের পরিণতি ঘটিয়াছে; ইতিপূর্বে তাহার জীবনে অন্য উপাদান সব ছিল, এবার অশ্রুও আসিয়া মিশিয়াছে। কৃষ্ণ যখন কাছে ছিল, তখন সে উপেক্ষা করিয়াছে। আজ সে নাই, আছে তাহার বাঁশির সুর। এই বাঁশির সুর তাহার চিত্তকে উন্মনা করিয়া দিয়া, একদিন যে-ভবিষ্যৎকে সে অবজ্ঞা করিয়াছিল, সেই ভবিষ্যতের দিকে, সেই অনন্তের দিকে তাহার চিত্তকে অভিসারে বাহির করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের দেহ তাহাকে তৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু এই গীতি-

মূর্তির আহ্বানে তাহার দেহের পালঙ্কের উপরে বিরহিণীর বিমুগ্ধ চিত্ত জাগিয়া উঠিল ; জাগিয়া উঠিয়া বিরহের শূন্য পটে স্মৃতির জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়া-আঁকিয়া দেখিতে লাগিল। এবারে রাধার দেহ মাত্র নয়, মন ভুলিয়াছে, কৃষ্ণের রূপে নয় কৃষ্ণের স্বরূপে। কে বলে চাঁদ চন্দন-সুশীতল! কে ইতিপূর্বে জানিত যে নব-কিশলয়ে দগ্ধ করে। আজ কানু বিনা যে দশদিক তাহার নিকট শূন্য, আজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একমাত্র বাঁশি ধ্বনিত!

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।

কিন্তু বিরহের এত তাপ সত্ত্বেও সে ছলনাময়ী রাধা! কৃষ্ণকে বশ করিবার জন্য তাঁহার বাঁশি চুরি করিয়া বসিল। মন চুরি হইলেও লোকের দু-চারি দিন চলিয়া যায়, কিন্তু বাঁশি-চুরি অচল। কৃষ্ণকে ধরা দিতে হইল।

বিরহখণ্ডের রাধা প্রায় পদাবলীর রাধা। সে হাসি নাই, সে রাগ নাই, সে পুলক নাই, আর নাই সে কথায়-কথায় তীব্র শ্লেষ। কৃষ্ণের চিন্তা জীবন ছাড়িয়া রাধার স্বপ্ন পর্যন্ত অধিকার করিয়াছে। সে প্রহরে-প্রহরে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া ওঠে। কৃষ্ণের সন্ধানে সে বৃন্দাবনে যাইবে— পথে বাঘ-ভালুকে খায় সেও ভালো। একদিন সে শিশুমতি ছিল, কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়াছে, আজ সেজন্য নিজেকে সহস্র-বার ধিক্কার। একদিন যে-দেবত্ব ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, কেমন করিয়া সে বুঝাইবে তাহাতে আর তাহার অবিশ্বাস নাই! দেশে যে বসন্ত আসিয়া পড়িল, অথচ তাঁহার দেখা নাই। রাধার মনের দুঃখ কে আর বুঝিতে পারে!

এবেঁ মোর মণেব পোড়নী
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।

যে দুঃখ কাহাকেও দেখানো চলে না সে যে শতগুণ দগ্ধ করে। আজ সে কখনো ঈর্ষায় আকুল, কখনো মূর্চ্ছায় বিকল। সে আজ—

খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥

এ-রাধা পদাবলীর ; ইহার 'বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী'। এ-

রাধার হাসিঠাট্টায়, রাগে ক্ষোভে, মানে অভিমানে, প্রেমে ঈর্ষায়, ছলনা চাতুরীতে, অবশেষে ভক্তিমুখী প্রেমে, আমরা ইহার সহিত একাত্মতা অনুভব করি। পদাবলীর রাধাকে দেখিয়া আমাদের ভক্তির উদয় হয়, তাহা আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের একাংশ মাত্র। বর্তমান রাধাকে দেখিয়া তাহার প্রতি মানবরসের সঞ্চার হয়, ইহা আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব। বহু শতাব্দী পূর্বে একদিন কবির হৃদয় হইতে এই মানবী কাব্যখানিতে আসন গ্রহণ করিয়াছিল— আশা করি কাব্যের এই নির্জনতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় সে আমাদের রসলোকে অবতীর্ণ হইবে।

ভাঁড়ু দত্ত

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক। যদিচ তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যকে কোনোক্রমেই উপন্যাস বলা চলে না, তবু বর্তমানে উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝি, তাহার ধর্ম অনেক পরিমাণে কবিকঙ্কণচণ্ডীতে বিদ্যমান। উপন্যাস ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ গল্প, বর্তমানে গদ্যে লিখিত, কিন্তু পদ্যে লেখা যে আদৌ অসম্ভব এমন নয়। উপন্যাসের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে বস্তু-নিষ্ঠা গুণটি ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে তাহাতে প্রবেশ করিতেছে। উপন্যাসের আদিযুগে বাস্তব সংসার ও উপন্যাস সমান্তর রেখায় চলিত। কিন্তু ক্রমে দুই রেখা দূরত্ব ঘুচাইয়া কাছে ঘেঁষিতে লাগিল— উনবিংশ শতকের শেষার্ধে তাহারা এত কাছে আসিয়া পড়ে যে একটি অপরটির ছায়া হইয়া উঠিল। ইহাই 'রিয়ালিজম' এই প্রক্রিয়া এখনো সক্রিয়। বাস্তবনিষ্ঠার উপরে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের এতই ঝোঁক যে, উপন্যাস প্রায় ফোটোগ্রাফের শামিল হইয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর, বাস্তবনিষ্ঠাই বর্তমানে উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। এই বাস্তবনিষ্ঠার সঞ্চারী ভাব নির্মমতা; আধুনিক ঔপন্যাসিক নিজের নাক-বরাবর চলিতে কৃতসংকল্প, তার ফলে তাহাকে যেখানে লইয়াই ফেলুন-না কেন, তাহার দুঃখ নাই— ইহাকে বলি নির্মমতা। মমত্ববুদ্ধি, রুচি, অভিপ্রায়কে সংযত করিয়া লেখক বাস্তব সংসারকে অনুসরণ করিতেছে, সংসারের বাস্তব ধর্মকে ধরিবে এই তাহার পণ।

এখন ইহাই যদি উপন্যাসের এবং আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে মুকুন্দরাম কেবল ঔপন্যাসিক নন, অত্যন্ত আধুনিক ঔপন্যাসিক। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে বাস্তবনিষ্ঠা ও নির্মমতা প্রচুর পরিমাণে বিরাজমান। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় প্রদর্শন প্রাচীন কাব্যের লক্ষণ। ইহা বাস্তবপন্থীও নয়, নির্মমও নয়, কারণ কবি কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছিবেন আগে হইতেই তাহা স্থিরীকৃত। মহাভারত ও রামায়ণের কবি আদর্শনিষ্ঠ। তাঁহাদের আদর্শ কাব্যের প্রথম শ্লোক রচনার আগে হইতেই নির্দিষ্ট; এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, রামের জন্মের পূর্বেই অর্থাৎ বস্তুগত ঘটনা ঘটিবার আগেই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। আবার তাঁহারা দুইজনেই নিষ্ঠুর, পঞ্চপাণ্ডব ও রামদম্পতিকে অশেষ দুঃখকষ্ট দিয়াছেন; কিন্তু

তাঁহাদের নির্মম বলা চলে না। পাণ্ডব ও রামচন্দ্রকে তাঁহারা দুঃখে কষ্টে ফেলিয়াছেন, কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত আদর্শকে প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই, বাস্তবের হাতে কল্পনার রশি তাঁহারা কখনো তুলিয়া দেন নাই। প্রাচীন কবিরা কাব্যপ্রবাহের ভগীরথ, কাব্য তাঁহাদের শঙ্খনিস্বন অনুসরণ করিয়া গিয়াছে। আর আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা মানচিত্র-অঙ্কনকারী, ঘটনাপ্রবাহকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের কলম চলে, একটু এদিক-ওদিক হইলে শিল্প স্বধর্মচ্যুত হয়।

আগেই বলিয়াছি কবিকঙ্কণচণ্ডীকে উপন্যাস না বলা গেলেও উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ দুটি তাহাতে আছে: বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতা। মোটের উপরে চণ্ডীকাব্যেও পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় অঙ্কিত, কবির লক্ষ্য আগে হইতেই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু কোনো-কোনো চরিত্রচিত্রণে কবি বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। এমন একটি, বোধকরি একমাত্র, চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত, অন্তত একমাত্র মনুষ্যচরিত্র। কারণ কবিকঙ্কণ পশুসমাজের যে-চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও বস্তুনিষ্ঠ।

ভাঁড়ু দত্ত লোকটা শয়তান। কিন্তু শয়তান আছে বলিয়াই তো সংসার সুখে-দুঃখে জমিয়া উঠিয়াছে। শয়তান না থাকিলে আদিদম্পতি আদম ও ইভ এখনো নন্দনবনে বসিয়া পরিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্য উপভোগ করিত। এখানে দেখি শয়তান ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্তে কালকেতু-উপাখ্যানের ঘটনাস্রোত উত্তাল হইয়া উঠিয়া পরিণামের মুখে ছুটিয়াছে।

কালকেতু বনজঙ্গল কাটিয়া গুজরাটের রাজা হইয়া বসিলে অনেক লোক সেখানে সুখে বসবাস করিবার আশায় আসিল। তাহাদের অগ্রণী আমলা হাঁড়ার দত্ত শ্রীমান ভাঁড়ু। সঙ্গে তাহার চিঁড়া দধি কলা প্রভৃতি ভেট, কানে গোঁজা তাহার খরশাণ কলম। সে আসিয়াই কালকেতুর সঙ্গে খুড়া-ভাইপো সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিল। ভাঁড়ু জানাইল যে গঙ্গার দুই কূলের কায়স্থসমাজ তাহার ঘরে আহারাদি করে, ঘোষ- ও বসু-কন্যাদ্বয়কে সে বিবাহ করিয়াছে, আর 'মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ'। এ-হেন পাত্রকে রাজ্যের প্রধান পাত্র করা কর্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কী! কালকেতু লোকটা upstart, হঠাৎ-বড়োলোক, ধন তার হইয়াছে, কিন্তু কুলের গৌরব নাই, কাজেই সে কুলীনশ্রেষ্ঠ ভাঁড়ুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। ভাঁড়ু রাজ্যের প্রধান পাত্র হইয়া পূর্বতন প্রধান বুলান মণ্ডলকে ম্লান করিয়া

দিল। শেষে রাজ্যের এমন অবস্থা করিয়া তুলিল যে, কালকেতুও ভাঁড়ুর ছায়ায় পড়িয়া গেল।

ভাঁড়ুর অত্যাচারে হাটুরে লোকের ব্যাবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম। কবিকঙ্কণ বলিতেছেন :

এমন সময় ভাঁড়ু দত্ত হাট মধ্যে আসে
পশারী পশরা ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে।
পশরা লুটিয়া ভাঁড়ু পুরয়ে চুবড়ি
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।
লণ্ডেভণ্ডে দেয় গালি বলে শালা মালা
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।
হাটুয়া টানয়ে ভাঁড়ু দত্ত নাহি ছাড়ে
কেশে ধরি করে কিল লাথি মারে ঘাড়ে।

তখন হাটুরে লোকে গিয়া কালকেতুকে নালিশ করিল। কালকেতু তখনো বনেদি ধনী হইয়া ওঠে নাই, দুঃখের স্মৃতি তখনো মনে আছে, তাই ভাঁড়ুকে ডাকিয়া অপমান করিল। ভাঁড়ু অপমান হজম করিবার লোক নয়, যদি তাহার প্রতিকার থাকে। এক প্রতিকার ছিল। সে কলিঙ্গরাজের নিকটে গিয়া কালকেতুর নামে সত্য-মিথ্যা অনেক বলিয়া-কহিয়া দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। যুদ্ধে কালকেতুকে পারিয়া ওঠা সহজ নয়, সে মহাবীর। তখন ভাঁড়ুর চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কালকেতু বন্দী হইয়া কলিঙ্গরাজ্যে চলিল। অবশেষে কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর মধ্যে বন্ধুত্ব হইল এবং কালকেতু পুনরায় সগৌরবে গুজরাট রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভাঁড়ু দেখিল মহাবিপদ। গুজরাটেই তাহার বিষয়সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদি। এখন কী উপায়? তখন সে আবার—

ভেট লৈয়া কাচকলা শাক কচু আলু মূলা
ভাঁড়ু দত্ত করয়ে জোহার
নোয়াইয়া বীরে মাথা কহে প্রবঞ্চন কথা
খুড়া দেখি খণ্ডিল আঁধার।

ভাঁড়ু কালকেতুকে জানাইল যে, তাহার বিরহে ও বিপদে ভাঁড়ুর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কিন্তু কালকেতু ভুলিল না। সে ভাঁড়ুকে অপমান করিয়া নাপিতের

ভোঁতা ক্ষুর দিয়া মাথা মুড়াইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিল। শহরের ছেলেমেয়েরা ভাঁড়ুকে টিটকারি দিতে লাগিল, কোটাল তাহার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিল। কেহ-কেহ তাহার পিছে-পিছে ঢোল বাজাইতে লাগিল। ভাঁড়ুর বিপদ দেখিয়া কালকেতুর মনে কষ্ট হইল। সে তাহাকে 'পুনর্বার দিল ঘরবাড়ি'।

এই তো ভাঁড়ুর জীবনচরিত। তাহার চিত্রটি বস্তুনিষ্ঠ কলমে ও নির্মমভাবে অঙ্কিত ; কেবল শেষের দিকে কবির নির্মমতা শিথিল। ভাঁড়ু দত্তের দণ্ডে পাপের পরাজয় চিত্রিত। কিন্তু ভাঁড়ুর মতো বুদ্ধিমান পাপী এত সহজে পরাজয় মানিবে কেন? সে গুজরাট রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার হাটুরে লোকের জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিবে। অনেক ভাঁড়ু আজকার দিনে দিব্য চোরাবাজারের কার-বারি, ধরা পড়িয়াও নামান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আর কালকেতু যদি তাহাকে দণ্ডই দিল, আবার তাহাকে ফিরিয়া ডাকা কেন? কালকেতুর মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য কি? এখানেও কবির নির্মমতা শিথিল। এই দুটি খুঁত বাদ দিলে ভাঁড়ুর চরিত্র যে-কোনো আধুনিক উপন্যাসের সামগ্রী হইতে পারে। ভাঁড়ু অত্যন্ত 'মডার্ন', তাহার মাসতুতো ভাই 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঠকচাচা।

বলা বাহুল্য, ভাঁড়ু দত্ত লোকটা অতিশয় দুর্জন। কিন্তু তবু তাহাকে অসহ্য লাগে না, কারণ মুকুন্দরাম তাহার চরিত্রে একবিন্দু 'কমিক' রস দিয়াছেন। ঐ বিন্দুটি তাহাকে তাজা করিয়া রাখিয়াছে, ঐ রসের গুণেই দর্শক তাহাকে ছাড়িতে চায় না। মুকুন্দরাম তাহাকে লইয়া নিশ্চয় খুব সংকটে পড়িয়াছিলেন। শ্রোতা-দের চিত্ত এমনভাবেই সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, কালকেতু ও ফুল্লরার প্রতি আর-কোনো ঔৎসুক্য তাহাদের ছিল না। শ্রোতাদের ভাব, গল্পটা থাকুক, তার চেয়ে ভাঁড়ুর ভাঁড়ামি চলুক। তখন বাধ্য হইয়া নিরুপায় কবি তাহাকে যেন-তেন-প্রকারেণ বিদায় করিয়া দিয়া গল্পের পরিণামটাকে রক্ষা করিলেন। ভাঁড়ু কেবল বাস্তব কালকেতুর সর্বনাশ করে নাই, কালকেতুর শিল্পরূপকেও মারিতে বসিয়াছিল। শেক্সপিয়র ফল্স্টাফকে লইয়া এমনই বিপদে পড়িয়াছিলেন। শেষরক্ষা করিতে না পারিলে কমিক চরিত্রের ট্র্যাজিক হইয়া উঠিবার আশঙ্কা।

ভাঁড়ু দত্তের চেহারা কেমন ছিল? রঙটি কালো, মেদের প্রাচুর্যে তাহাতে চিকনাই লাগিয়াছে, স্থূলাকার ভুঁড়িটি অগ্রগামী, ভুঁড়ির তাল সামলাইতে গিয়া হেলিয়া-দুলিয়া চলিতে অভ্যস্ত ; শরীরের তুলনায় পা দু-খানি খাটো, প্রয়োজন-

মাত্রেই হাসি ও অশ্রু টানিয়া আনিতে পারে; মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে; মাথা ও হাত নাড়িয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস। আর বসন সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—'ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব'। ভাঁড়ুর এ-রূপ আমার মনগড়া নয়। যে-কোনো জমিদারের কাছারিতে গেলেই ভাঁড়ুর দেখা মিলিবে। বাংলাদেশে ভাঁড়ু অত্যন্ত সাধারণ জীব। মুকুন্দরাম সাধারণকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাই শিল্পের অসাধ্যসাধন।

ঊর্মিলার মধুর নামটির জন্য একালের কবিগুরু সেকালের কবিগুরুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরাও অনুরূপ কারণে কবিকঙ্কণকে ধন্যবাদ জানাইতে পারি। চণ্ডীকাব্যে বীভৎস রসের অভাব নাই। ব্যাধ, চোয়ার প্রভৃতির কাহিনী লিখিতে বসিয়া মুকুন্দরাম কলমকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিন্তু রক্ষা এই যে, চণ্ডীকাব্যের পাত্রপাত্রীর নামগুলি মধুর। লহনা, খুল্লনা, রত্নমালা ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রত্যেকটি নাম মধুবিন্দু ক্ষরণ করে। আবার, যদিচ কালকেতু লোকটা অত্যন্ত চোয়াড় প্রকৃতির, ব্যবসায়ে সে ব্যাধ, তবু তাহার কালকেতু নামটাতে কবির আশীর্বাদ আছে। আর শুধু তাহার নামই বা কেন? তাহার সঙ্গের সকলেরই মধুর নাম। সুকেতু, ধর্মকেতু, কালকেতু, পুষ্পকেতু। কালকেতু ও তাহার পত্নী পূর্বজন্মে ছিল নীলাম্বর ও ছায়াবতী। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে মধুরতম নাম ফুল্লরা, বসন্তকালের ফুলের মধুবিন্দু সংগ্রহ করিয়া নামটি রচিত। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দিলে যে প্রহসন হয় না, বাস্তবকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা হয়, মুকুন্দরাম তাহা জানিতেন। তাই ব্যাধকন্যা ও ব্যাধপত্নীকে তিনি ফুল্লরা বলিয়া ডাকিয়াছেন। ফুল্লরা শব্দটির অর্থ কী? 'ফুল্লরাব' হইতে ফুল্লরা হওয়া অসম্ভব নয়; তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, ফুলের মতো মৃদু ও লঘু যাহার কথা। আবার ফুলের উপরে যে মৌমাছি বসিয়া গুঞ্জন করে, সেই রকম মৃদু গঞ্জনাও আছে ফুল্লরার কণ্ঠে; সেই রকম মৃদু গুঞ্জনেই মনে পড়িয়া যায় যে জীবটি মধুর ভাণ্ডারি।

ফুল্লরা কালকেতুর পত্নী, সঞ্জয়কেতুর কন্যা। আবার একটি মিষ্ট নাম। কিরাতের কাহিনীতে এত নামের ছড়াছড়ি দেখিয়া কুমারসম্ভবের সেই বর্ণনা মনে পড়ে— মন্দাকিনীর নির্ঝরশীকরে সিক্ত দেবদারুর তুষারমণ্ডিত অধিত্যকায় যেখানে কেবল কিরাত ও বন্য পশুর সমাগম, সেখানে পথে-ঘাটে যেমন যত্রতত্র গজমোতিসমূহ পড়িয়া থাকে। একদিন ঘটক আসিয়া ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতুর সহিত ফুল্লরার বিবাহের প্রস্তাব করিল। সঞ্জয়কেতু ফুল্লরার পরিচয় দিতে গিয়া বলিল— 'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে'। ফুল্লরা চণ্ডীকাব্যের দ্রৌপদী। ভালো রাঁধিতে না জানিলে মুকুন্দরামের কাছে মুখ পাইবার উপায় নেই। বেচারা একদিন শাপলার নাল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল, তাই সুযোগ পাইলেই কল্পনায় সে রাজভোগ আহার করিত। কাব্য যদি জীবনের 'কপি' মাত্র হইত, তবে তো এমন হইবার কথা নয়। কবিতা আর যাই হোক জীবনের নকলনবিশ নয়। সাহিত্য ক্রমেই মাছিমারা কেরানির কীর্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

যাক, তারপরে যথাশাস্ত্র ফুল্লরা ও কালকেতুর বিবাহ হইয়া গেল এবং কালকেতু পত্নীর রন্ধনবিদ্যার পরিচয় পাইয়া ভীমের আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিল : 'রন্ধন করিছ ভাল, আর কিছু আছে'? কালকেতু বন হইতে জন্তু জানোয়ার মারিয়া আনে, ফুল্লরা সেই মাংস হাটে-বাজারে বিক্রয় করে, এ-বিদ্যাতেও সে নিতান্ত অপটু নহে। একদিন শিকার মিলিল না, ঘরে খুদকুঁড়াও নাই, ফুল্লরা সখীর বাড়িতে চাউল ধার করিতে গেল। ওদিকে কালকেতু শিকারে গিয়া একটি জীবন্ত গোধা বাঁধিয়া আনিল। গোধা বা গোসাপটি ভগবতীর ছদ্মবেশ। ফুল্লরার কুটিরে আসিয়া ভগবতী ষোড়শী তরুণীর মূর্তি ধরিলেন। তখন কালকেতু ঘরে ছিল না। তরুণীকে স্বগৃহে দেখিয়া ফুল্লরা চমকিয়া উঠিল— ভাবিল এ এক নূতন বিপদ। এতদিন তবু সুখে-দুঃখে চলিতেছিল—এ অগ্নিশিখা আসিল কোথা হইতে! ভগবতী বলিলেন, তোমার স্বামীই আমাকে নিজগুণে বাঁধিয়া আনিয়াছে, আমার বাড়িঘর নাই, এখানেই কিছুকাল থাকিব ভাবিয়াছি। ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ফুল্লরা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, আমরা বড়োই দরিদ্র, ভাত জোটে না, ভাঙা কুঁড়ে, শীতে কাঁপি, আর যখন খাদ্য জোটে তখন আধার জোটে না, 'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান'। ফুল্লরা বলিল, এখানে সুবিধা হইবে না বাপু, অন্যত্র যাও। কিন্তু ভগবতী বিশেষ উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাঁহার গেলে

চলিবে কেন ? তিনি নড়িলেন না। তখন ফুল্লরা স্বামীকে গিয়া ধরিল, বলিল, এ কেমন তোমার ব্যাভার ? এখানে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ফুল্লরার পুষ্পমৃদু রব, পুষ্পলীন মৌমাছির মতো গুঞ্জন করিয়া উঠিয়াছে।

কাহিনীকে অকারণ বিতানিত করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবতীর কৃপায় কালকেতু অগাধ ধনরত্ন পাইল। সেই টাকায় সে বন কাটিয়া গুজরাট রাজ্য স্থাপন করিল। তারপরে ভাঁড়ুর ষড়যন্ত্রে কলিঙ্গরাজের সহিত লড়াই বাধিয়া, আবার ভাঁড়ুব ষড়যন্ত্রে সে বন্দী হইল। তারপর উভয় রাজায় মিত্রতা হইয়া গেলে কালকেতু পুনরায় গুজরাট বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এবারে কাব্য শেষ হইবার পালা। তাই দেবতার আদেশে কালকেতু পুষ্পকেতুকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাহারা—কালকেতু ও ফুল্লরা—দেবদেহে স্বর্গে চলিয়া গেল। তাহারা ছিল শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর ও ছায়াবতী, ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ। ইহাই কালকেতু-কাহিনীর সংক্ষেপ।

সাহিত্যে যাহারা সমাজ-চৈতন্য খোঁজে চণ্ডীকাব্য তাহাদের লুটের মাহাল। এত অবিকৃত সমাজ-চৈতন্য আর-কোনো কাব্যে আছে কিনা জানি না। বাস্তবিক, চণ্ডীকাব্য সামাজিক ইতিহাসের দলিল, না কাব্য— তাহা এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিজের ধারণা, যে-প্রচুর উপাদান মুকুন্দরাম পাইয়াছিলেন সেগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া কাব্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইন্ধনের ভারে অগ্নি এখানে দুর্বল, তাই শিখার চেয়ে ধুমই প্রবল, আর ধুমের চেয়েও অনেক প্রবল ইন্ধনের স্তূপ। সমাজ-চৈতন্য-অনুসন্ধিৎসুর কাছে এই ইন্ধনেরই সমাদর।

অনায়ত্ত ইন্ধনের আধিক্য সত্ত্বেও মুকুন্দরাম কয়েকটি নরনারীর চিত্র অঙ্কনে সফলকাম হইয়াছেন। একটি ভাঁড়ু দত্ত, অপরটি বেনে মুরারি শীল। আর-একটি ফুল্লরা। কিন্তু ফুল্লরার চরিত্র অর্ধসমাপ্ত অর্থাৎ ইহার প্রথমার্ধেই কবির কৃতিত্ব। ব্যাধগৃহিণী ফুল্লরার চরিত্র কবিকঙ্কণ যথাযথ আঁকিয়াছেন, কিন্তু রাজগৃহিণীর ছবি কিছুই হয় নাই; সেখানেও সে ব্যাধ-গৃহিণী হইয়াই আছে। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ছিল, দরিদ্রের ছবি আঁকিতে পারিতেন, কিন্তু ধনীর চিত্র তাঁহার কল্পনার অতীত। পর্যবেক্ষণশক্তির উপরেই মুকুন্দরামের প্রতিষ্ঠা— যখনই তিনি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়াছেন, সফল হইয়াছেন; কিন্তু যখনই

কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। একসঙ্গে পর্যবেক্ষণের পা এবং কল্পনার পাখা অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। মুকুন্দরামের দু-খানা বেশ শক্ত রকমের পা ছিল। পাখার আভাস ছিল না তা নয়, তবে সে-পাখা হাঁসের পাখা, তাহাতে ওড়া চলে না, বড়োজোর মাচার উপরে উঠিয়া বসা চলে। এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার সগোত্র।

ধনের অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামের ছিল না, তাই কালকেতু ও ফুল্লরাকে রাজা ও মহিষী করিয়া আঁকিতে পারেন নাই, তাই ধনপতির কাহিনীতে তাঁহার কলম দ্বিধাগ্রস্ত। যদি আমরা ভুলিয়া যাই যে ফুল্লরা রাজমহিষী হইয়াছিল, তবেই তাহার চরিত্রের পূর্ব- ও উত্তর-পর্বে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইব। কলিঙ্গরাজ গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করিলে ফুল্লরার দুর্বলতা কালকেতুকে ভীরু করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পরামর্শেই কালকেতু ধানের মাচায় লুকাইয়াছে, তাহার নির্বুদ্ধিতাতেই সে কোটালের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে— আর কালকেতুকে বাঁচাইবার অনুরোধ করিয়া ফুল্লরা নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় কোটালের কাছে কান্নাকাটি শুরু করিয়াছে। এ-সব রাজমহিষীর স্বভাবসংগত নয়। অবস্থার পরিবর্তনে তাহার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। ফুল্লরার চরিত্রের শেষার্ধের এই শোচনীয় চিত্রগুলিকে ভুলিয়া গিয়া তবে তাহার বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বেচারাকে দোষ দিয়া কী ফল? ইহা তো কবিরই অক্ষমতা।

কবিকঙ্কণ যেখানে সক্ষম, সেখানে তিনি একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ এবং তাহারই অনুষঙ্গরূপে নির্মম। ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীলের ন্যায় বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র আধুনিক কালের সমাজ-সচেতন লেখকেরা আঁকিতে পারিয়াছেন কি? আধুনিকদের বস্তুনিষ্ঠা ঠিক বস্তুটিকে ধরিতে পারে না, শেয়ালের পা ধরিতে বটের শিকড় ধরে।

ফুল্লরা ও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র বস্তুনিষ্ঠ পন্থায় আঁকিতে শুরু করিয়া কবিকঙ্কণ হঠাৎ কেন পথ-পরিবর্তন করিলেন? বস্তুনিষ্ঠ পন্থা যুগোচিত সাহিত্যধর্ম ছিল না, ওটা তাঁহার একান্ত স্বকীয় ধর্ম। অগোচরে তাঁহার কলমকে স্বধর্ম পরিচালিত করিতেছিল বটে, কিন্তু যখনই তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন, অমনি যুগধর্ম প্রবল হইয়া উঠিল, বস্তুনিষ্ঠা আদর্শনিষ্ঠায় বিলীন হইল, নির্মমতার স্থলে তন্ময়তা দেখা দিল। হঠাৎ পথ-পরিবর্তনের ইহাই রহস্য।

ফুল্লরা মেয়েটি মন্দ নয়, দরিদ্রঘরেব বধূ হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দরিদ্র যদি হঠাৎ মোটা-বকমের লটারির টাকা পায়— সেকালে যাহা ছিল চণ্ডীর হঠাৎ-দয়া, একালে তাহাই লটারির টাকা— তবে তাহাকে লইয়া মুশকিল বাধিবে। গরিবঘবের স্বভাব সে ছাড়িতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংসাবে গরিব লোকেব সংখ্যাই অধিক, কাজেই ফুল্লরার স্থানের অভাব হইবে না। স্থানের তো অভাব হইবে না— কিন্তু ফুল্লরা কোথায়? ফুল্লরা দুষ্প্রাপ্য।

হীরা মালিনী

বাংলা সাহিত্যে ভাঁড়ু দত্তের যদি কেহ জুড়ি থাকে তবে সে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের হীরা মালিনী— 'কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম'। একদিন হাটের মধ্যে এই দুইজনে হঠাৎ সাক্ষাৎকার হইয়া গেলে কী কাণ্ড ঘটিত, তাহাই ভাবিতেছি। ভাঁড়ু দত্ত কীভাবে অকুতোভয়ে হাট লুট করিয়া বেড়াইত, দেখিয়াছি। এ-বিষয়ে হীরাও বড়ো কম যায় না, তবে তাহার পন্থা ভিন্ন। ভাঁড়ু বলের আশ্রয় লইত, কারণ সে জানিত, রাজার বাহুবল তাহার সহায়। হীরার সে-রকম কোনো ভরসা ছিল না, তাই তাহাকে প্রধানত নিজের বাক্যবলের উপর নির্ভর করিতে হইত, অবশ্য সঙ্গে অশ্রুবলও ছিল। সুন্দরের প্রদত্ত টাকা ঘরে রাখিয়া দিয়া দুটি মেকি টাকা (সেকালেও মেকি টাকা ছিল জানিয়া অনেকে আশ্বস্ত হইবেন) লইয়া সে হাটে চলিল। তার পরে—

চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে ॥···
যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দু হাতে গণিয়া ॥

হীরা বাড়ি ফিরিয়া গিয়া সুন্দরকে বেসাতির হিসাব দেয়— সে-হিসাব বঙ্গ-সাহিত্যে pun-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে হীরা তামা-কে রুপা বলিয়া চালাইতে সক্ষম, সে যে এক শব্দকে দুই ভিন্নার্থে চালাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের কী!

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভাঁড়ু যদি হয় humour-এর প্রতিনিধি, হীরা তবে wit-এর। 'হিউমার' ও 'উইট' -এর তত্ত্বগত পার্থক্য নিরূপণ সহজ নয়, কিন্তু বস্তুগত পার্থক্য মোটামুটি সহজেই ধরা যায়, আরও সহজ হইবে যদি ভাঁড়ু ও হীরার চরিত্র মনে রাখি। ইতিপূর্বে ভাঁড়ুকে স্থূলকায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি—

হিউমার একপ্রকার স্থূলতা, একপ্রকার উদারতা। 'উইট' তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ বলিয়াই কৃশ, যেমন কৃশ তীক্ষ্ণ অসিলতা। হীরা কৃশা, তাহার বয়স আর-একটু কম হইলে তন্বী বলা চলিত। হীরার বিশদ বিবরণ ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥

এই বর্ণনায় হীরার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সব তথ্যই কবি জানাইয়া দিয়াছেন। হীরার উইট সানন্দে সহ্য করি, কিন্তু সে হিউমারের চেষ্টা করিলে অসহ্য হইত। রবীন্দ্রনাথ কোনো জায়গায় বলিয়াছেন যে, পুরুষ ফল্‌স্টাফকে উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নারী ফলস্টাফ হইলে গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিত, তার কারণ আর-কিছু নয়, পুরুষের প্রকৃতিতে এক প্রকার স্থূলতা আছে, যাহা হিউমারের অনুকূল। নারীপ্রকৃতির সংকীর্ণ খাপের মধ্যে উইটের যথার্থ আশ্রয়। নারী রিয়ালিস্ট, উইট রিয়ালিজমের অস্ত্র। উদার হিউমার আদর্শনিষ্ঠ। সরস্বতী উইট, কারণ উইট মূলত জ্ঞান; আর গণেশ হইতেছেন হিউমার; হিউমারের ভিতরে-বাহিরে একটা অসংগতি আছে, সেই অসংগতি দেখিতে পাই গণেশের স্থূলদেহের ও সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বন্দ্বে।

হীরা ও ভাঁড়ু প্রাচীন কবিদ্বয়ের সার্থক, বোধকরি সার্থকতম, চরিত্র-সৃষ্টি। তাঁহারা দু-জনেই অনেক রাজা, বীর ও বরাঙ্গনা সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু হীরা ও ভাঁড়ুর কাছে তাহারা নিষ্প্রভ। চরিত্র-সৃষ্টি তিন উপায়ে হইতে পারে: রচনা,

বর্ণনা ও সৃজনা। রচনা হইতেছে বিভিন্ন অংশ, কাহিনী বা গুণ একত্র করিয়া সৃষ্টি। বর্ণনা হইতেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ব্যাখ্যা ও তাহাতে অলংকারের আরোপ, যেমন মালা পরাইলে বুঝিতে হইবে কণ্ঠ, বালা পরাইলে বুঝিতে হইবে হাত। আর সৃজনা হইতেছে উদ্দিষ্ট চরিত্রের উন্মীলন, অর্থাৎ যাহা আছে তাহাকে মেলিয়া ধরা। যাহা আছে বলিতে বুঝি, সেই চরিত্র কোনো-না-কোনো রূপে মানব-সংসারে আদি হইতেই আছে, লেখকের আগে হইতেই আছে, এখন একরকম রহস্যময় যোগাযোগের ফলে লেখক তাহাকে আর-সকলের জ্ঞানগোচর করিয়া দিলেন। আমার এ-কথা আদৌ 'প্যারাডক্স' নয়। বাস্তবে প্রাণসঞ্চার যদি মানুষের সাধ্য না হয়, তবে কাব্যে তো আরও অসম্ভব, যেহেতু কাব্য বাস্তবতর, আর বাস্তব মানুষের আয়ুর চেয়ে কাব্যের নরনারীর আয়ু দীর্ঘতর। তাই ইহাকে সৃজনা না বলিয়া আবিষ্করণা বলাই উচিত। বলা উচিত যে, কলম্বাস যেমন আমেরিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শেক্সপিয়র তেমনি ফল্স্টাফকে ও বাল্মীকি তেমনি রামচন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই একই ভাবে, অবশ্য সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে, কবিকঙ্কণ ভাঁড়ুকে আর ভারতচন্দ্র হীরাকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের মানসিংহ ও ভবানন্দ রচনা মাত্র। কতকগুলি ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তিমূলক তথ্যকে সংগ্রহ করিয়া দুটি মনুষ্যমূর্তিকে তিনি দাঁড় করাইয়াছেন; তাহারা নড়ে-চড়ে বটে, কিন্তু স্বকীয়তায় নয়, কবি প্রয়োজনবোধে নাড়ান বলিয়া। তাহারা কাহিনীর বাহন। সার্থক চরিত্রসৃষ্টি কাহিনীকেই আপন বাহন করিয়া লয়, অনেক সময়ে লেখকের অভীষ্ট লক্ষ্যের বিপরীতে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যায়; অনেক সময়ে তাহার প্রাণের আতিশয্যে পথের মধ্যে কাহিনীর ঘোড়া মরিয়া পড়ে, সোয়ার ছুটিতেই থাকে। সার্থক চরিত্রসৃষ্টি সর্বদাই কাহিনীর চেয়ে বড়ো।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দর বর্ণনা মাত্র। বাক্য-অলংকারে ও স্বর্ণ-অলংকারে তাহারা এমনই ভারগ্রস্ত যে নড়িতেও অক্ষম, ভবানন্দ ও মানসিংহ তবু নড়িত-চড়িত। বিদ্যা ও সুন্দরকে বিশ্বাস করিতে হইলে কবির কথায় বিশ্বাস করিতে হয়! কাঙ্গারু-শাবকের মতো, জন্মের পরেও তাহারা জন্মদাতার কুক্ষিগত!

কেবল, হীরাকে বিশ্বাস করিবার জন্য আর কাহারো সাক্ষ্যে আবশ্যক হয় না; সে শুধু স্বতন্ত্র নয়, স্বয়ম্ভূ। ভারতচন্দ্রের আগে হইতেই সে ছিল, কবি তাহাকে

উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন। হীরা মালিনী কবির আবিষ্করণা।

ভারতচন্দ্রের প্রতিভাকে লঘু করিবার ইচ্ছা আমার নাই। সচেতন শিল্পী হিসাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। বর্তমান যুগেও মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁহার জুড়ি দেখি না। কেবল বলিতে চাই যে, চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভায় তাঁহার বিশিষ্টতা নয়। কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়? সাহিত্যে ঐটিই একমাত্র গুণ নয়। বর্ণনা, শ্লেষ, ভাষার স্বচ্ছন্দ অসিক্রীড়া— এ-সমস্ত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ। এইসব গুণেই ভল্টেয়ার টিকিয়া আছেন, ভারতচন্দ্র আছেন, বার্নার্ড শ টিকিয়া থাকিবেন। কেবল হীরা মালিনীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। হীরা মালিনী তাঁহার বিশিষ্ট গুণের ফল নহে, নিতান্তই **tour de force**, সেকালের কৃষ্ণনগরের রাজপথে পড়িয়া-পাওয়া রত্ন। ঐতিহাসিকদের কাছে শুনিয়াছি, প্রাচীনকালের অনেক শহর তাহার বিপুল ঐশ্বর্য ও জনতা লইয়া নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তারপরে অনুসন্ধিৎসুর হাতে ধ্বংসস্তূপের রহস্য ভেদ করিয়া একটা তামার মুদ্রা বা জীর্ণ তাম্রলিপি ধরা দিয়াছে— প্রাচীন গৌরবের উহাই একমাত্র অর্বাচীন সাক্ষী। অন্নদামঙ্গল-কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি আজ সম্পূর্ণ প্রাণহীন , কেবল ঐ কোন্দলপরায়ণা মালিনীটা আজও জীবিত, এতই সজীব যে কাছে যাইতে সাহস হয় না, পাছে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়; কিংবা সর্বনাশ, সুন্দরের মতো নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে লইয়া যায়। সুড়ঙ্গটার প্রতি যে লোভ নাই তাহা নয়, কিন্তু গতজীবনা বিদ্যার কক্ষে যাইবার কষ্ট কে স্বীকার করিত? অবশ্য হীরা মালিনীকে দেখিবার লোভ স্বাভাবিক, কিন্তু সেজন্য অত দূরে যাইবার প্রয়োজন কী? তাহার বংশ আজিও লোপ পায় নাই।

ঠকচাচা

বিজ্ঞজনেরা খল ও অসাধু ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়াইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা এ-বিষয়ে এমনই স্থিরসংকল্প যে, পণ্ডিতের সঙ্গে নরকগমনও বাঞ্ছনীয়, তবু খল ব্যক্তির সঙ্গে স্বর্গে যাওয়া কিছু নয়, বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে এ-উপদেশ মানিয়া চলাই ভালো সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে আসিলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; দেখা যায় যে সকলেই শঠ ও খলের সঙ্গ কামনা করে। ডিকেন্সের উপন্যাসে বহুতর শঠ খল ভণ্ড ও পাষণ্ড আছে। তাহারা এতই চিত্তাকর্ষক যে, পাঠক পুস্তকের পাতা উলটাইয়া আড়-চোখে দেখিয়া লয়— আবার তাহারা কখন প্রবেশ করিবে। তাহারা বিদায় লইবার সময়ে পাঠকে আশা করে, হয়তো তাহারা শেষ মুহূর্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটা সরস উক্তি করিয়া যাইবে। তাহারাই যেন উপন্যাসের প্রাণাবেগকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ আর-কিছুই নয়, সাধু-সজ্জন ব্যক্তির চেয়ে অসাধু ও খল অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। বাস্তব জীবনে তাহারা ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তাহাদের সে-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সেখানে তাহারা আনন্দদায়ক, আর-কিছুই নয়।

প্রাচীন ও নবীন বাংলা সাহিত্যে যে-সব অসাধু-শিরোমণির সাক্ষাৎ পাই তাহাদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত একজন প্রধান, আর-একজন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ঠকচাচা ওরফে মোকাজান মিঞা। সুনীতির মানদণ্ডে ভাঁড়ু দত্ত ও ঠকচাচা যতখানি খাটো, সুবাক্যের মানদণ্ডে তাহারা ততখানি বড়ো। অনেকের পক্ষে তাহাদের সঙ্গটাই স্বর্গসুখ, তাহাদের সঙ্গে স্বর্গে গমন তো উপরি-পাওনা। এখানেই বোধকরি বিধাতার দয়া, বাস্তবে তাহাদের হীন করিয়াছেন বলিয়াই শিল্পের ক্ষেত্রে সে-ন্যূনতা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। দুই জায়গাতেই তাহাদের মারিবেন বিধাতা এমন নিরপেক্ষ নির্দয় নহেন।

'আলালের ঘরের দুলালে' অসাধু ব্যক্তির অভাব নাই, সংখ্যায় তাহারাই অধিক। সকলেই ঠকচাচার প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু প্রতিভার জোরে সে আর-সকলকে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে; ঠকচাচী ছাড়া ঠকচাচার তুলনা মেলা ভার; কেবল

চাচীর কাছে চাচা কিঞ্চিৎ সংযত। বাবুরামবাবু বিপদে অর্থাৎ একটি কঠিন মামলায় পড়িয়া ঠকচাচার শরণাপন্ন হইলেন। তার পরে লেখকের বর্ণনা পড়া যাক—

'অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে— সাক্ষী সাজাইয়া দিতে— দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে —গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে— দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন, আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে— রমজান ইদ সোবেরাত আমার করা সার্থক— বোধ হয় পিরেব কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদ্‌রৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে।'

ঠকচাচা সম্বন্ধে আর-একটি বর্ণনা দেখা যাক—

'ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি— গায়ে পিরাহান— পায়ে নাগোরা জুতা —হাতে ফটিকের মালা— বুজর্গ ও নবীব নাম নিয়া এক ২ বার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন, কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মত চালাক লোক পাওয়া ভার। পুলিসে আসিয়া চারিদিগে যেন লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিলেন। একবার এ দিগে যান— একবাব ও দিগে যান— এক বার সাক্ষিদিগের কাণে ২ ফুস ২ করেন এক ২ বার বাবুবাম বাবুব হাত ধরিয়া টেনে লইয়া যান— এক ২ বার বটলব সাহেবের সঙ্গে তর্ক করেন— এক ২ বার বাঞ্ছারাম বাবুকে বুঝান। পুলিসের যাবতীয় লোক ঠকচাচাকে দেখিতে লাগিল।'

আমরাও দেখিতেছি, আর বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের পাঠক চিরকাল সবিস্ময়ে দেখিতে থাকিবে।

এক হিসাবে অবশ্য ঠকচাচাব অসাধুতা খুব বেশি অসাধারণ নয়— বিশ্লেষণ করিলে তাহার মানসিক উপাদান আমাদের অনেকের মধ্যেই মিলিবে, তবে মাত্রায় কম আর বেশি। সে অসামান্য ঠকচাচার ব্যক্তিত্ব, ঐ ব্যক্তিত্বের ধাক্কায় তাহার অসাধুতা এমন উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

ঠকচাচা বাবুরামবাবুকে বুঝাইতেছে যে তাঁহার ছোটো ছেলে রামলাল মন্দ নহে, কেবল বরদাবাবুর শিক্ষার গুণেই এমন হইয়াছে। ঠকচাচার সঙ্গে মতে না মিলিলেও বলিয়া রাখি, বরদাবাবু একজন সাধু ব্যক্তি আর তাঁহার শিক্ষার গুণে

রামলাল শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে— লেখকেরও সেই অভিপ্রায়। ঠকচাচা বাবুরামবাবুকে বলিলেন—

'মোশার লেড়্কা বুরা নহে, বরদাবাবুই সব বদের জড়— ওনাকে তফাত করিলে লেড়্কা ভালো হবে— বাবু সাহেব! হেন্দুর লেড়্কা হয়ে হেন্দুর মাফিক পাল পার্ব্বণ করা মোনাসেব, আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই —দুনিয়া সাচ্চা নয়— মুই একা সাচ্চা হয়ে কি কর্‌বো?'

'দুনিয়া সাচ্চা নয়— মুই একা সাচ্চা হয়ে কি কর্‌বো?' আমাদের অধিকাংশেরই ঐ কথা! ঐ সামান্য রন্ধ্রপথে সংসার কীর্তিনাশার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে! সংসার যদি মন্দ, আমি তবে ভালো হই কেন— ইহাই ঠকচাচার জীবনতত্ত্ব। অধিকাংশ লোকেরই ঐ তত্ত্ব। তবে অপরে যাহা ক্ষুদ্র ও অপ্রকট, ঠকচাচায় আসিয়া তাহা স্পষ্টোচ্চারিত ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আর স্রোতের সঙ্গে বাতাসের মতো আছে ঠকামির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠেলা— দুয়ে মিলিয়া ঠকচাচা চিত্তাকর্ষকদের চূড়ান্ত।

ঠকচাচার সমগ্র ইতিহাসবর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেবল পরিণামটুকু বলিলেই চলিবে। জাল করিবার অপরাধে ঠকচাচা ও তাহার সাকরেদ বাহুল্যের দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে—

'এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে মাণিকযোড়ের মত, এক জায়গায় বসে— এক জায়গায় খায়— এক জায়গায় শোয়, সর্ব্বদা পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে— মোদের নসিব বড় বুরা— মোরা একেবারে মেটি হলুম, ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে, মোকান বি গেল— বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না— মোর বড় ডর তেনা বি পেণ্টে সাদি করে।'

বিপদে পড়িয়াছে বলিয়াই জানা গেল যে ঠকচাচারও ডর আছে, আমরা তো তাহাকে অকুতোভয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। এটা মন্দের ভালো। কিন্তু ভালোর মন্দ দিকটাও সামান্য নয় এবং সেখানেই লেখকের সঙ্গে আমার মতভেদ।

ঠকচাচাকে দণ্ড দেওয়া উচিত হয় নাই; সে অবশ্যই দণ্ডযোগ্য, সেই কারণেই বিনা দণ্ডে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পাঠক যাচিয়া গিয়া দণ্ডদানের ভার লইত;

কিন্তু লেখক পূর্বপক্ষ হইয়া দণ্ড দেওয়াতে পাঠকের মন তাহার ক্ষমার সুপারিশ করিতে থাকে। অধর্মের পরাজয়সাধনের বা দণ্ডদানের ভার নিজহাতে না লইয়া পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই লেখকের কর্তব্য। বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের ঐখানে তফাত। বাস্তবের দণ্ড বাস্তব হওয়া আবশ্যক, কিন্তু শিল্পের দণ্ড অন্যরূপে হইয়া থাকে। লেখক যদি ঠকচাচাকে দণ্ড না দিতেন তবে পাঠক ফাঁসির ব্যবস্থা করিত, পুলিপোলাও-এ সন্তুষ্ট হইত না।

আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থে সকল সাধু ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত এবং সকল অসাধু ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত দণ্ডিত হইয়াছে— এটা গ্রন্থের একটা প্রধান ত্রুটি, ঠক-চাচার দণ্ডও এই সাধারণ ত্রুটির অন্তর্গত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও ভাঁড়ু দত্ত সম্বন্ধে ঠিক এই ভুলটিই করিয়াছেন, অদৃষ্টের হাতে তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছেন, ভরসা করিয়া পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই।

ভাঁড়ু দত্ত ও ঠকচাচা বাংলা সাহিত্যের মানিকজোড়। ঠকচাচার সঙ্গে কেহ স্বর্গে যাইতে চাহিবে না, দ্বীপান্তরে তো নয়ই— কিন্তু তাই বলিয়া অবসরের দু-চারিটি দণ্ড যাহারা ইহাদের সঙ্গে কাটাইতে রাজি নয়, তাহারা সাধুপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ নয়। সংসারে সাধুপুরুষের সংখ্যা অল্প হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সংখ্যা অল্প হইলেই বিপদ— কারণ তাহারাই যে salt of the earth।

রাবণ

মেঘনাদবধ-কাব্যের রাবণ-চরিত্র বাংলা সাহিত্যের নরনারীদের মধ্যে বোধ-করি বৃহত্তম চরিত্র। দশাননের আকৃতির কথা বলিতেছি না, সে তো আছেই, সে তো বাল্মীকির কীর্তি, তার জন্য মধুসূদনের বিশেষ কৃতিত্ব নাই। আমি বলিতেছি, অতলস্পর্শী শোকের গৌরবে ত্রিদিববিজয়ী রাবণ একপ্রকার মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে— সমুদ্রোপকূলবর্তী তরঙ্গাভিঘাত-অভিষিক্ত মহীধর যেমন স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে উচ্চতর, স্বাভাবিক অটলতার চেয়ে অটলতর মনে হয়, অনেকটা তেমনি। তার উপরে অস্তগামী সূর্য যখন আবার বেদনার আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দেয় তখন আর তাহাকে লৌকিক বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোন স্বয়ংকিরীটিত অলৌকিক মহিমা মানব-নয়নের সার্থকতাসাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষণকালের জন্য রূপ-পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে। বাস্তবিক, রাবণ-চরিত্রকে কোনো মহীধর বলিয়াই মনে হয়, তাহাকে মানবহস্ত-নির্মিত, মানবচিত্ত-পরিকল্পিত মনে হয় না। পাষাণের মূর্তি যত প্রকাণ্ডই হোক-না কেন, তবু তাহাতে মানবস্পর্শ বিদ্যমান। কিন্তু যে-গিরিবর প্রকৃতির লীলাসম্ভূত, বহু কোটি বর্ষাঋতু অদৃশ্য নিপুণতায় যাহাকে একটা বিশেষ আকৃতি দিয়াছে, বহু কোটি শরৎ যাহার স্কন্ধে কুয়াশা-উত্তরী নিক্ষেপ করিয়াছে, বহু কোটি শীত সযত্নে যাহার শীর্ষদেশে তুষার-উত্তরী বাঁধিয়া দিয়াছে, আর অবশেষে সকল প্রসাধনের উপসংহারে বহু কোটি বসন্ত পুষ্পাভরণে যাহাকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে, বহু লক্ষ ভূমিকম্প যাহার কঠিন পাষাণরাশি স্খলিত করিয়া দিয়া নিদারুণ আর্ত মন্দ্র জাগাইয়া দিয়াছে, কাছে দাঁড়াইলে যাহা শিলা-স্তূপ মাত্র, দূর হইতে যাহা বিশিষ্ট আকৃতি, অর্ধেক অস্পষ্ট, অর্ধেক ইঙ্গিতময়— খানিকটা পার্থিব, অনেকটাই অপার্থিব, যাহার সৃষ্টিকার্যে স্বয়ং প্রকৃতি ধৃত-খনিত্র— মানবজাতির যে অগ্রজ এবং মানবজাতি লোপ পাইবার পরেও যে বিরাজ করিতে থাকিবে— মেঘনাদবধ-কাব্যের রাবণ সেইরকম একটি অমানবীয় সামগ্রী।

মাইকেলের রাবণ প্রাকৃতিক শক্তির (elemental force) সৃষ্টি। প্রাকৃত শক্তি যেমন এখনো মাঝে-মাঝে একটা-আধটা গিরিচূড়া ঠেলিয়া খাড়া করিয়া দেয়,

এক-আধটা উপসাগর অকস্মাৎ খনন করিয়া দেখায়, রাবণ-চরিত্র তেমনি প্রাকৃত শক্তির একটা কাজ— লবণাম্বু-অভিহত দুর্ধর্ষ গিরিচূড়ার ন্যায় সে দণ্ডায়মান। এমন যে হইতে পারিল— কোনো-কোনো সময়ে সমাজে প্রাকৃতিক শক্তি প্রবল হইয়া ওঠে। শ্যামল সুবিন্যস্ত ভূ-পৃষ্ঠের অন্তরে নিত্যবিরাজিত অগ্নিদ্রব্যের ন্যায় সমাজের নীচের তলায় প্রাকৃতিক শক্তি সতত ক্রিয়াশীল হইলেও সদাসর্বদা তাহা প্রবলরূপে প্রত্যক্ষগোচর হয় না— তজ্জন্য ভূমিকম্পের আবশ্যক। সামাজিক ভূমি-কম্পের ফলেই রাবণ-সদৃশ প্রাকৃতিক (elemental) চরিত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে— একা মানুষের সাধ্য কি তাহাদের সৃষ্টি করে। 'ডিভাইন কমেডি'-র অনেকগুলি চরিত্রেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ— অথচ অল্পকাল পরে লিখিত 'ডেকামেরোন' গ্রন্থ দিব্য সুস্থ মেজাজের রচনা। মারলোর টেম্বারলেন একটি প্রাকৃতিক চরিত্র —মারলোর অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক শক্তি সক্রিয়— তুলনায় শেক্সপিয়রের দু-একটি চরিত্র বাদে, লীয়রের কথাই এখন মনে পড়িতেছে, অধিকাংশ সুস্থ মেজাজের কল্পনা। গ্যেটের ফাউস্ট-চরিত্রে প্রাকৃতিক লীলা থাকিলেও মারলোর ডক্টর ফস্টাসের চেয়ে অনেক অল্প। ব্রন্টি-ভগ্নীগণ স্বল্পায়ু ও স্বভাব-রুগ্ন হইলেও তাঁহাদের অনেক রচনাতেই এই প্রবল শক্তিটি সক্রিয় —'ওয়াদারিং হাইট্‌স্'-এ প্রাকৃতিক শক্তি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অশরীরী মূর্তিতে, স্থানীয় আবহাওয়ারূপে নিজেও যেন বিদ্যমান; 'জেন আয়ার'-এ তাহা অপেক্ষাকৃত স্তিমিত। পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে হার্ডির অনেকগুলি উপন্যাস ও 'ডাইনাস্টস্' নামে মহাকাব্য প্রাকৃতিক শক্তির লীলারসে উদ্ভূত। বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধের রাবণ ব্যতীত প্রাকৃত চরিত্র তো দেখি না।

উপরে যে-সমস্ত লেখকের নাম করা হইল তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাকৃতিক চরিত্র যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই যে প্রতিভায় অপরের চেয়ে মহত্তর—এমন প্রমাণ হয় না। দান্তের সঙ্গে বোকাচিওর তুলনা হয় না বটে, তেমনি আবার শেক্সপিয়রের সঙ্গেও মারলোর তুলনা হয় না, আর মারলোর ডক্টর ফস্টাসের চেয়ে গ্যেটের ফাউস্ট অনেক উচ্চতর শ্রেণীর সৃষ্টি। আসল কথা, প্রাকৃত চরিত্রের সৃষ্টি একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে। সেই বিশেষ সময়ের দাবিকে বিকাশ করিবার জন্য বিশেষ একপ্রকার প্রতিভার প্রয়োজন। তাহা কাহারো থাকে, কাহারো থাকে না, কাহারো অল্প থাকে। মানুষের মনকে

যদি দুই ভাগ করিতে পারি, তবে একটা অংশ প্রাকৃতিক, একটা অংশ ব্যক্তিগত; একটা আদিম কালের বাহন, একটা অর্বাচীন কালের বাহক; একটা সংস্কার-মুক্ত, অপরটা সংস্কৃতি-সম্পন্ন। অল্পাধিক দুটা ভাগই সকলের মনে আছে—কাহারো কোনোটা প্রবল, কাহারো কোনোটা দুর্বল। মাঝে-মাঝে সমাজে উপপ্লবের সময় আসে, তখন লেখকদের মনের প্রাকৃত অংশটা নাড়া খায় এবং অনেক সময়ে অনেক সৌভাগ্যে এক-আধটা মহৎ প্রাকৃত চরিত্র সৃষ্ট হইয়া দেখা দেয়। মেঘনাদবধের রাবণ এইরকম একটা সৃষ্টি।

২

মাইকেল মধুসূদনের সমকাল বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটা উপপ্লবের সময়, এমন উপপ্লব বাংলাদেশের সমাজে অনেক কাল ঘটে নাই। তখনকার অনেক উচ্চ-ইংরাজি-শিক্ষিত লোকে কেবল যে বিলাতি মদ খাইত এমন নয়, ইংরাজি সভ্যতাও তাহাদের মনে মদের প্রক্রিয়া করিত। প্রত্যেক ইংরাজি বই তাহাদের চোখে মদের বোতল ছিল। তাহারা বাংলা ভাষা ভুলিল, সাহেব হইবার আশায় খ্রীস্টান হইল, ঐ আশাতেই নিজের নামটি অতদ্ভু ইংরাজি বানানে লিখিয়া বিকৃত করিয়া তুলিল, ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিবার কল্পনা তাহারা পোষণ করিত। 'রাম ও তাহার অনুচরগণে'র প্রতি ঘৃণা, রাবণ ও মেঘনাদের চিন্তামাত্র কল্পনার উদ্দীপনা—এ কেবল মাইকেলের মনোভাব নয়, তাঁহার সমকালীন অনেকেরই মনের ভাব ছিল। দেশীয় সবকিছুই হেয়, বিলাতি সবকিছুই বরেণ্য—ইহাই ছিল সাধারণ আবহাওয়া। এ-হেন অবস্থার মূর্ত প্রতীক রাবণ ও তাহার পুত্র। রাবণের ঐশ্বর্য, রাবণের বীরত্ব, রাবণের রাম-বিদ্বেষ, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা—তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মাইকেল মুখে স্বর্ণলঙ্কা বলিলেও মনে-মনে ইংলণ্ডের কথাই ভাবিতেন। উপরি-উক্ত মনোভাবকে, সামাজিক অবস্থাকে গুলাইয়া লইয়া ইংরাজি-শিক্ষিতের প্রতিনিধিরূপে মাইকেল রাবণ-চরিত্র ঢালাই করিয়াছিলেন। রাবণকে তিনি এত প্রকাণ্ড করিয়া গড়িয়াছিলেন যে তার চেয়ে বড়ো করা সম্ভব ছিল না—তাই তুলনায় রাম ও লক্ষ্মণ ছোটো হইয়া গেল। বাল্মীকির পরে অনেক ভারতীয় কবি রামায়ণ-কাহিনী লিখিয়াছেন—কিন্তু মাইকেলের কাব্যের সঙ্গে তাঁহাদের কাব্যের মূলগত

প্রভেদ এই যে, তাঁহারা কেহই রাবণের জয়ধ্বনি করেন নাই। মাইকেল প্রথম রাবণের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র বলিলে মাইকেলের রাবণকে ছোটো করিয়া ফেলা হয়; কারণ যে-রাবণ একটা বিশেষ সময়ের সামাজিক অবস্থার দুর্গে বন্দী সে আমাদের কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে অক্ষম। আমরা অপর-কালের অধিবাসী, আমরা মাইকেলের সমকালীন আদর্শের প্রতি বিশ্বাসহীন; তাঁহারা ছিলেন ইংরাজি শেখার আরম্ভে, আর আমরা রহিয়াছি ইংরাজি ভুলিবার সূচনায়। তৎসত্ত্বেও যে রাবণ আমাদের রসলোক উন্মথিত করিতে পারে তার অন্য কারণ আছে। মাইকেল রাবণের মহিমার সহিত অপর-একটি উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেটি অপরিমেয় বেদনা। সেই বেদনার জ্বালাতেই রাবণ আজ আমাদের সমবেদনার পাত্র, আমাদের সগোত্র। আজ ইংরাজি শিক্ষার মোহ অপগত, ইংরাজ-শাসনের ব্যর্থতাই আজ শুধু বিদ্যমান। মহিমার অত্যুচ্চ চূড়ায় আসীন হইয়াও পার্শ্ববর্তী সুগভীর খাদটাই কেবল রাবণের চোখে পড়িয়াছে। এত ঐশ্বর্য, এত প্রতাপ সত্ত্বেও সর্বনাশ যে কেন শনৈঃ শনৈঃ নিকটবর্তী হইতেছে সে বুঝিতেই পাবে নাই—তাই সে প্রত্যেকটি বিপৎপাতের পরে এই মর্মে খেদোক্তি করিয়াছে—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

এবং

বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?

কী পাপে তাহার দণ্ড সে যেমন জানে না, তেমনি সে-দণ্ড হইতে যে নিষ্কৃতি নাই, তাহাও জানে। এই দুটি উক্তিতেই মেঘনাদবধ-কাব্যের রাবণ-চরিত্রের ধুয়া নিহিত।

এ ধুয়া মাইকেল শুনিতে পাইলেন কোন্ মন্ত্রবলে? তাঁহার সমকালে বাঙালির তো এমন দুর্দশার কারণ ছিল না! স্বাধীনতা গিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজ-শাসনকে তৎকালে কেহই অবাঞ্ছনীয় মনে করিত না। তখনকার দিনে কুড়িটা ইংরাজি শব্দ লিখিতে পারিলে চাকুরি জুটিত, দু-খানা ইংরাজি বই পড়িলেই লোকে পণ্ডিত মনে করিত। হিন্দুসমাজ তখন ইংরাজের সুয়োরানী ছিল, পরবর্তী-

কালের মতো মুসলমান-সমাজকে সে-পদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া বুক-চাপড়ানো শুরু করে নাই। তবে এ-খেদোক্তির তাৎপর্য কী? সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি রাবণের মুখে তবে এ-বিলাপ এ-নৈরাশ্য কেন? সমাজের মধ্যে সে-ব্যর্থতা সে-বেদনা তো ছিল না।

এখানেই মাইকেলের যথার্থ কবিদৃষ্টি, ইহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-দর্শনের পরিচয়। মাইকেল হ্যামলেটের মতো বলিতে পারিতেন— 'O my prophetic soul!' তিনি সেকালে বসিয়া দূরকালকে, তাঁহাদের সময় হইতে আমাদের সময়কে, ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভ হইতে তাহার উপসংহারকে, বাঙালি-সমাজের উন্নতির সূচনা হইতে তদীয় অবনতির সূত্রপাতকে যেন দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর সেইজন্যই রাবণের চরিত্রে ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিষাদকে, প্রতাপের সঙ্গে নৈরাশ্যকে, দম্ভের সঙ্গে সকরুণ খেদোক্তিকে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এ-হেন বিষম উপাদানে গঠিত বলিয়াই রাবণ দুটি অসমকালের প্রতীক হইতে পারিয়াছে রাবণ সেকালেরও প্রতিনিধি, একালেরও বটে। এই কারণেই রাবণ-চরিত্র অতিশয় 'মডার্ন'। এই কারণেই রাবণের সঙ্গে, রাবণের স্রষ্টা মাইকেলের সঙ্গে বর্তমান কাল নূতন করিয়া আত্মীয়তা অনুভব করিতেছে।

একালের আমরা কি রাবণের মতো নিরন্তর খেদ করিতেছি না? কী পাপে আমাদের বর্তমান দুর্দশা তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি? কিসে মুক্তি তাহা কি বুঝিতে পারিতেছি? একটার পরে একটা দুর্ভাগ্যের আঘাতে আমরা কি বলিতেছি না—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি আমাদের ভালে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বাঙালি-সমাজের সুখ-সৌভাগ্যে ভাটার টান শুরু হয়। প্রথমে পাট গেল, তার পরে ইংরাজ শাসনকর্তার প্রশ্রয় গেল, সেইসঙ্গে সুলভ চাকুরি গেল।

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি আমাদের ভালে?

তারপর আসিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ মন্বন্তর, মহামারী, কন্‌ট্রোল, রেশন, চোরাবাজার, কলিকাতার

হাঙ্গামা, নোয়াখালি, বঙ্গবিভাগ, উদ্বাস্তুতা! শ্রেণীবদ্ধ দুর্ভাগ্যের আর যেন শেষ নাই—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি আমাদের ভালে ?

কিন্তু এখানেই কি দুর্ভাগ্যের অবসান ? আসামে বিহারে উড়িষ্যায় দার্জিলিঙে, বঙ্গান্তরে সর্বত্র আজ বাঙালি লাঞ্ছিত। এ-লাঞ্ছনা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়াছে মনে হয় না, মনে হয় এখনো—

বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

আজ লঙ্কার অর্থ বাংলাদেশ, সেদিন লঙ্কার অর্থ ছিল ইংলণ্ড। অপগত ঐশ্বর্যের দিকে তাকাইয়া কপালে করাঘাত করিয়া আমরা কি রাবণের মতোই বলিতেছি না—

কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ?

মাইকেলের কাল আমাদের কালের দিকে তাকাইয়া বলিতে পারিত—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি— বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।

মেঘনাদবধ-কাব্য একাদেহে বাঙালির উত্থান ও পতনের মহাকাব্য। সৌভাগ্যের উষায় যে-কাব্যের পটে বাঙালি আপনার গৌরবময় মধ্যাহ্নকে দেখিয়াছিল, সৌভাগ্যের সন্ধ্যায় আজ আবার তাহারই পটে নৈরাশ্যের অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। দুর্ভাগ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধ-কাব্য আজ নূতন গভীরতা লাভ করিয়াছে। এখনই মেঘনাদবধ-কাব্য বুঝিবার প্রকৃত সময়, কারণ এ-কাব্য প্রৌঢ়বয়সের কাব্য ; দুঃখের অভিজ্ঞতা ভারি হইয়া উঠিলে তবেই ইহার

যথার্থ রসগ্রহণ সম্ভব হয়, তবেই বীরের ক্রন্দন যে কী মর্মন্তুদ দৃশ্য বুঝিতে পারা যায়। শোকের আঘাতে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম চরিত্রটি ও বাঙালি-সমাজ আজ কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে— তাই পরস্পরকে আজ কতকটা বুঝিতে পারিতেছে। শিল্পের সম্মিলিত জাতির আসরে মেঘনাদবধ-কাব্যের রাবণই বর্তমান বাঙালি-সমাজের যথার্থতম প্রতিনিধি।

প্রমীলা

মা ই কে লে র অ ঙ্কি ত নারীচরিত্রগুলির মধ্যে মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রমীলা সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। বীরাঙ্গনা-কাব্যের পত্রিকাগুলির নায়িকা রমণী— কিন্তু তাহারা কেহই প্রমীলার পূর্ণতা পায় নাই—তাহাদের আসর সংকীর্ণ। শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী পূর্ণাঙ্গ বটে, কিন্তু নাটক মাইকেলের প্রতিভার অনুকূল না হওয়ায় তাহারা অনেকটা বিকল। তিলোত্তমা ছায়াপ্রায়। কেবল প্রমীলাকেই সম্পূর্ণ ও সজীব বলা চলে। এমন যে হইল তার কারণ, মেঘনাদবধ-কাব্যের আসর প্রমীলার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত, আর কাব্য ও অমিত্রাক্ষর হইতেছে মাইকেলের প্রতিভার যথার্থ বাহন। তা ছাড়া, ঘটনার বহুলতার দ্বারাই চরিত্রের বিকাশসাধন মাইকেলের প্রতিভার রীতি— মেঘনাদবধ-কাব্যে ঘটনা-বাহুল্যের অভাব ঘটে নাই।

প্রমীলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী? সে বীররমণী, কিন্তু তাই বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন বীর নহে— মেঘনাদের সাক্ষাতে সে লতার ন্যায় কোমল; তাহার অসাক্ষাতে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে মহীরুহের ন্যায় দৃঢ়; কোমল-কঠোরের ছায়াতপে সে গঠিত। ছায়াতপকে প্রমীলার চরিত্রে মাইকেল সুকৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন। বীরত্বের দ্বারা সে পাঠককে বিস্মিত করে, কোমলতার দ্বারা সে পাঠককে মুগ্ধ করে— আর বীরত্ব ও কোমলতার দ্বন্দ্বে পাঠকের বিস্ময় ও মোহকে বর্ধিত করে। এইভাবে ক্রমবর্ধমান বিস্ময় ও মোহের তরঙ্গশিখরে পাঠকের চিত্ত আন্দোলিত হইতে-হইতে নবম সর্গে আসিয়া দেখিতে পায়, প্রমীলা আর আগের প্রমীলা

নাই— চিতানলের অগ্নিময় স্যন্দনারূঢ়া সে দেবী, তার চরিত্রে মানবী, দানবী ও দেবীর সমন্বয় সংঘটিত। কোমলতায় সে মানবী, বীরত্বে সে দানবী, আর স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিসর্জনে সে দেবী। এইজন্যই তাহার চরিত্রে এমন একটি পূর্ণতা দেখি যাহা মাইকেল-অঙ্কিত অন্য নারীচরিত্রে বিরল।

প্রথম সর্গে মেঘনাদের যুদ্ধগমনের আয়োজনে সে শঙ্কিত, সে বলিতেছে—

কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ?

তৃতীয় সর্গে মেঘনাদের বিরহে সে ব্যাকুলা—

ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।

তার পরে মেঘনাদের মিলন-আশায় লঙ্কায় প্রবেশের বিপদের আশঙ্কা শুনিয়া তাহার সুপ্ত বীরত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে—

কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?

সখী-সনাথা প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের উদ্‌যোগ ও দৃশ্য সর্বজনবিদিত, সবিস্তার

পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু লঙ্কা-প্রবেশের পরে ইন্দ্রজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার দৃঢ়তা অন্তর্হিত।

পঞ্চম সর্গে প্রাতঃকালে মেঘনাদ কর্তৃক প্রমীলার ঘুম-ভাঙানোর দৃশ্যটি মনোরম ও বিচক্ষণ—

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। মিল, প্রিয়ে, কমললোচন!

প্রমীলার ইচ্ছা স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাগারে যায়—কিন্তু অন্তরায় তাহার শ্বশ্রূঠাকুরানী।

ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমিন্দরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ।...

তোমার বিহনে,
আঁধার জগত নাথ, কহিনু তোমারে!

অবশেষে নবম সর্গে প্রমীলার জীবনের চরম লগ্ন সমাগত—

লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি। মায়েরে মোর—

আর সে বলিতে পারে না, শোক সংবরণ করিয়া আবার আরম্ভ করিল—

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?

আর কি কহিব, সখি? ভুলো না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!

শুধু সখী কেন, পাঠকেরাও তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। শুধু কোমলকে ভোলা যায়, শুধু কঠোরকে আরও অনায়াসে ভোলা যায়—কিন্তু কোমলে-কঠোরে সুখদুঃখের ছায়াতপে গঠিত মানুষকে ভোলা সুখদুঃখের জীব মানুষের পক্ষে বোধকরি অসম্ভব।

প্রমীলা-চরিত্রের পরিকল্পনায় মধুসূদন অসাধারণ মানব-মনোজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। প্রমীলা বীরপত্নী। প্রকটব্যক্তিত্ববান পুরুষেরা ছায়ার প্রতি রৌদ্রের ন্যায় প্রচ্ছন্ন-ব্যক্তিত্ব নারীর প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। নিজের মধ্যে যে দুঃসহ জ্বালা বর্তমান তাহার সান্ত্বনা ঐ নারীর মাধুর্য। এইজন্যেই দুই অসম-স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃত ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়—সমস্বভাব পরস্পরকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাই বলিয়া এ-কথা বলি না যে, বীরপুরুষ ভীরু রমণীকে পছন্দ করে—মোটেই না। সে দৃঢ়সংকল্প রমণীকেই পছন্দ করে—কিন্তু আশা করে যে, দৃঢ়তাটুকু স্বামীর পরোক্ষে বিকশিত হইয়া স্বামীর প্রত্যক্ষে সে কেবল কোমলতারূপেই প্রতিভাত হইবে। বীরের পত্নী, উগ্রব্যক্তিত্ববানের পত্নী যদি সমান বীর হয়, উগ্রব্যক্তিত্ববতী হয়, তবে গ্রহে-গ্রহে সংঘাতের ন্যায় দুইজনের সংঘর্ষে যে-আগুন জ্বলিয়া ওঠে তাহাতে সংসার ধ্বংস হয়, শান্তি ধ্বংস হয়—তাহারা নিজেরাও পুড়িয়া খাক হইয়া ধ্বংস হয়। মনস্তত্ত্বের এই সংবাদটি মাইকেল জানিতেন বলিয়াই প্রমীলাকে দৃঢ়তা দিয়াও, বীরত্ব দিয়াও, মেঘনাদের সমক্ষে সে-সব প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। আপন বীর্যের প্রতিষেধক রূপে পুরুষ মাধুর্যের অনুসন্ধিৎসু—সে নারীকেই প্রার্থনা করে, ছদ্মবেশী বৃহন্নলা তাহার কাম্য নয়।

এবারে প্রমীলার চরিত্র-পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত করিতে চাই। মাইকেল প্রমীলা-চরিত্রের আভাস কোথায় পাইলেন? অপর কোনো নারী-চরিত্রে কি অনুরূপ কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন? আমার কেমন যেন ধারণা, প্রমীলা-চরিত্রের প্রাথমিক ইঙ্গিত মধুসূদন তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা চরিত্রে দেখিয়াছিলেন। হেনরিয়েটা ও প্রমীলার মূলগত মিল আছে, দু-জনেরই স্বভাব দৃঢ় হইলেও স্বামী-সকাশে দৃঢ়স্বভাব নয়—অত্যন্ত কোমল, একেবারে স্বামীগত-

প্রাণ। হেনরিয়েটার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা কিছু পরিমাণে প্রকট হইলে মধুসূদনের শেষ জীবন এমন শোচনীয় হইত না, অর্থাভাব এমন নিদারুণ হইত না। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা ও প্রবণতার বিরুদ্ধে কিছু করিবার, এমনকি স্বামীর মঙ্গলের জন্যও কিছু করিবার চিন্তা হেনরিয়েটার মনে কখনো প্রবেশ করিত না। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ব্যক্তিত্বে আত্মমজ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দৃঢ়তা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অল্প ছিল না। তাঁহার জীবনে অন্তত দুইবার সে-পরিচয় পাওয়া যায়। একবার অনাহারের মুখ হইতে পুত্রকন্যাদের ছিনাইয়া লইয়া তিনি মধুসূদনের সঙ্গে মিলিত হইবার আশায় ইউরোপে গিয়াছিলেন— আর-একবার ইউরোপে অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া পুত্রকন্যাদের লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মনে রাখা দরকার যে, দুইবারেই মধুসূদন অনুপস্থিত। সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কাজ দুটি নিতান্ত সহজ ছিল না, প্রখর বুদ্ধি ও উগ্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে কেহই এমন কাজে সক্ষম হইত না। হেনরিয়েটার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব যে এত প্রবল, মধুসূদনের অভাবেই কেবল তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী-সমক্ষে সে কোমলা, স্বামীর অভাবে সে প্রবলা— ইহাই হেনরিয়েটা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, আবার ইহাই প্রমীলা-চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য। ঘরের মধ্যে যে-আদর্শ বিরাজিত, প্রমীলা-চরিত্র অঙ্কনকালে মধুসূদনকে তাহা একেবারেই প্রভাবিত করে নাই— এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে বিষয়টাকে প্রমাণসহ করিতে আরও খুঁটিয়া দেখা আবশ্যক— কেহ চেষ্টা করিলে বাঙালি পাঠকসমাজ উপকৃত হইবে— আমি ইঙ্গিত দিয়াই খালাস।

নববাবু

যে মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ-কাব্য ও বীরাঙ্গনা-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কীভাবে আবার 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করিলেন— অনেককেই এ-বিস্ময় প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তৎকালীন কোনো-কোনো লোককেও এই অসংগতি চমকাইয়া দিয়াছিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে সেই কালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

'It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.'

প্রহসন দু-খানির রচনাকাল ১৮৫৯— এই সময় 'তিলোত্তমা' রচনারও কাল বটে।

মাইকেলের বাংলা গদ্যের কলম জড়তাগ্রস্ত ছিল। তাঁহার একখানি বাংলা পত্র পাওয়া গিয়াছে— তাহার ভাষা যেমন জড়, তাহার শোকপ্রকাশের ভাবও তেমনই কৃত্রিম। 'কৃষ্ণকুমারী'র গদ্য নিতান্ত কৃত্রিম ; 'হেক্টর বধে'র ভাষা কিস্তূত। অথচ প্রহসন দু-খানির ভাষা স্বচ্ছ, অনায়াস ; সংলাপ নাটকীয়, হাস্য- ও শ্লেষ-সমুজ্জ্বল ; আর নরনারীগণ সকলেই বাস্তব জীবনের সহচর— না তাহারা পৌরাণিক, না ঐতিহাসিক, না ছায়াপ্রায়। তাহারা এমনই সজীব যে, পায়ে কাঁটা ফুটিলে রক্ত ক্ষরিত হইবার আশঙ্কা। বাস্তবিক তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রহসন দুটির এমন শ্রেণীগত পার্থক্য যে বিস্মিত হইবার কথা বটে।

কিন্তু বিস্মিত হইলে তো কাজ চলিবে না, বিস্ময়ের অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কার না করা অবধি সমালোচকের ছুটি নাই। আমার একটি ধারণা যে, কোনো লোকের মুখের বা কোনো লেখকের দুটি কথায় বা দুটি রচনায় আপাত-প্রভেদ যতই দুস্তর হোক-না কেন, কোথাও নিশ্চয় একটা নিগূঢ় ঐক্য থাকিবেই— নহিলে সংসারটাই পাগলামি হইত। অনেক বলিবেন, পাগলামি বইকি ! পাগলের কথায় সংগতি কোথায় ? পাগলের কথা যে আমাদের অসংগত বোধ হয় তাহার একমাত্র কারণ, পাগলের মনের গতিবিধি ও ইতিহাস আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত নয়। পূর্ণ পরিচয় পাইলে দেখিতাম, উন্মাদের প্রলাপও গোপন যুক্তিজালের দ্বারা সুবিন্যস্ত। এমন ক্ষেত্রে মেঘনাদবধ-কাব্য ও প্রহসন দুটি যে সত্যই অসংগত, তাহা বোধ হয় না। দূর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া ইহাই আমার প্রত্যয় হইয়াছে যে, মেঘনাদবধ-কাব্য ও প্রহসন দুটি একই সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি— তাহাদের রূপ ভিন্ন হইলেও স্বরূপ এক। তৎকালীন সমাজমনের পজিটিভ দিকের বিকাশ মেঘনাদবধ-কাব্যে, আর নেগেটিভ দিকের বিকাশ প্রহসন দু-খানিতে। চাঁদের এক পিঠ চিরজ্যোতির্ময়, অপর এক পিঠ চিরান্ধকার— তবু তো তাহা একই উপগ্রহের এ-পিঠ ও-পিঠ।

মধুসূদনের প্রতিভার এ-পিঠ ও-পিঠ মহাকাব্য আর প্রহসন। আলো-অন্ধকারের উপমা ব্যবহার করিতে চাই না— তাই একটাকে positive approach- বা ইতিবুদ্ধি-, অপরটাকে negative approach- বা নেতিবুদ্ধি-সঞ্জাত শিল্পসৃষ্টি বলিলাম।

২

যে-সমাজমনের আদর্শ রূপ মেঘনাদবধ-কাব্য, তাহারই বাস্তব রূপ 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। অন্যত্র এক প্রসঙ্গে মাইকেলকে আমি কাব্যসাধনার সব্যসাচী বলিয়াছি, তাহা এই কারণেই— তাঁহার এক বাহু আদর্শ সত্যের দিকে, আর অপর বাহু বাস্তব সত্যের দিকে প্রসারিত। দুটি রূপই মাইকেলের মনকে সমান নাড়া দিয়াছিল, নাড়া-খাওয়া মনের ভিতর হইতে যুগল প্রবাহ নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছে। কবির নিজের কথাই ধরা যাক। 'মাইকেল মধুসূদন' শব্দ দুটির মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস যেমন সংক্ষেপে, যেমন স্পষ্টভাবে লিখিত, এমন আর কোথায়? সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত, রিচার্ডসন-ডিরোজিয়োর ছাত্ররা মদ খাইত, গোলদিঘির রেলিঙের শিক টপকাইয়া গিয়া শিককাবাব খাইত, বাহাদুরি দেখাইবার আশায় ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিত। পৃথিবী বানান লিখিতে প-এ ঋ-ফলা না র-ফলা— জিজ্ঞাসা করিয়া গৌরববোধ করিত। এ-সমস্তই নির্যাসিত আকারে কি 'মাইকেল' শব্দটির মধ্যে নিহিত নাই? আবার তাহারাই তো ইংরাজি সাহিত্যের স্রোতে গা-গাসান দিয়া মুক্তির মোহানার দিকে যাত্রা করিয়াছিল— আজ আমরা যা-কিছু সুফল ভোগ করিতেছি, তাহার গোড়াপত্তন করিতেছিল— ইংরাজি সভ্যতার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া তাহাকে আমাদের জন্য শোধন করিয়া শোভন করিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল— সেই তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া কি মধুসূদনকে লওয়া যায় না? ঐ লোকটির মধ্যে দুটি ব্যক্তি ও দুটি ব্যক্তিত্ব বিরাজমান ছিল। একজন স্নব, মদ্যপ, দেশীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের নিন্দুক, কুসংস্কার ছিন্ন করিবার নামে নূতন সংস্কারের প্রবর্তক; আর-একজন নূতন সূর্যের চাতক, নূতন বন্দরের নাবিক, বিদেশী সভ্যতার নীলকণ্ঠ; একজনের মনের কথা—'রাম ও তাহার অনুচরদের আমি ঘৃণা করি', আর-একজন বলিয়াছে—'মেঘনাদের চিন্তায় আমার কল্পনা উদ্দীপিত হইয়া ওঠে', সে বলে, 'রাবণ একজন মহামহিম পুরুষ'। আরও সংক্ষেপে বলা চলে যে, একজন

রাবণ, আর-একজন নববাবু। একজন তৎকালীন অবস্থার আদর্শ রূপ, আর-একজন বাস্তব রূপ। এই কথাগুলি মনে রাখিলে প্রহসন দু-খানির পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যাইবে— বুঝিতে পারা যাইবে, তাহারা আকস্মিক নয়, যথাযথ কার্যকারণ-সম্ভূত। মাইকেলের কলমে ইহাদের সৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র নায়ক নববাবু একটা শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। এমনকি, নববাবু যে কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ইংরাজি-পড়া নূতন নববাবুর দল বা ইয়ং বেঙ্গল, তাহা তৎকালীন লোকেরাও বুঝিয়াছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্‌ঘোষণই বর্ত্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোনও না কোনও নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' আবার আর-একজন বলিয়াছেন যে, 'ইহা দ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।' তৎকালীন লোকে প্রহসন দু-খানির বাস্তব ইঙ্গিত সম্বন্ধে সজাগ ছিল— তাই পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে লিখিত হইয়াও নাটক দুটি তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারে নাই। নববাবুগণ এবং পুরাতন ভক্তগণ অনেক তদবির-তদারক করিয়া অভিনয় বন্ধ রাখিতে বাধ্য করিয়াছিল।

এবারে বুঝিতে পারা যাইবে, যে-মাইকেলের গদ্যের কলম স্বভাবত এমন জড়তাগ্রস্ত, এ-দুখানিতে তাহা এমন সচল লঘু সুনিপুণ হইল কেন? এ-ক্ষেত্র যে মাইকেলের প্রতিভার স্বক্ষেত্র! 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা' তাঁহার প্রতিভার স্বক্ষেত্র নয়— তিনি যেন পরের জমিতে চাষ করিতেছিলেন— ও-কাজ বেগার। কিন্তু প্রহসন দুটি মেঘনাদবধ বা বীরাঙ্গনার মতোই তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভূমি— সে-অভিজ্ঞতা এতই ঘনিষ্ঠ যে, নববাবুর অনুরূপ নিমচাঁদ-চরিত্রে কেহ-কেহ মাইকেল-চরিত্রের আভাস দেখিতে পাইয়াছেন।

৩

প্রহসন দু-খানি, বিশেষ 'একেই কি বলে সভ্যতা', বাংলা প্রহসনের আদর্শ হইয়া আছে, যেমন পরবর্তী শিক্ষিত মদ্যপ চরিত্রের আদর্শ নববাবু। আর ইহার সংলাপের চটক, শ্লেষ প্রভৃতিও আজ পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য, কিন্তু অননুকরণীয়

হইয়া বিরাজ করিতেছে। মত্ত নববাবুকে দেখিয়া কর্তা গৃহিণীকে বলিতেছেন—

'ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি ?

'নব। হিয়র, হিয়র, হুরে !'

তখনকার অনেক নববাবুই নিশ্চয় নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে-মনে কর্তার প্রস্তাব সমর্থন করিত। গিরিশচন্দ্র উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িয়া বিস্ময়ে নাকি বলিয়াছিলেন— 'মধু কী খাইয়া ইহা লিখিয়াছিল?' মধু যে কী খাইয়া লিখিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং নববাবু কী খাইয়া ইহা বলিয়াছিল, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। কিন্তু ইহার irony অত্যন্ত নিদারুণ। ইহা উইট-এর স্তর হইতে হিউমার-এর স্তরে উন্নীত হইয়াছে। আর, নববাবুর বন্ধু কর্তার কাছে নিজের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে কী বলিবে, তাহা ভাবিতেছে, সে বলিতেছে— 'তোমাদের কর্তাকে কি বলিব যে আমি বিএরের— মুখটি— স্বকৃতভঙ্গ' : এ pun-এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে নাই— এ বোধকরি, কেবল পানশীল ব্যক্তির কল্পনাতেই আসিতে পারিত।

কাঞ্চন

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে, কেবল অটলবিহারী নয় স্বয়ং লেখক অবধি কাঞ্চনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। আর কেবল কাঞ্চনের কাছেই বা বলি কেন, নিমে দত্তর কাছেও বটে। নিমে দত্তর আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়, সে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে **witty** মাতাল; আর প্রকৃতিস্থের মধ্যেও, কি সাহিত্যজগতে কি বাস্তবজগতে, তার মতো বাগ্‌বাণিজ্যের রথ্‌চাইল্ড একান্ত দুর্লভ। অটলবিহারী মদের মায়া কাটাইতে পারে নাই, কাঞ্চনের মায়া কাটাইতে পারে নাই— এ-সবের মূলে বোধকরি নিমে দত্তর বাগ্‌বৈভবের মায়া। নিমে দত্তর ইন্দ্রজাল ছেদ করিতে পারিলে অটল কামিনীকাঞ্চনের ঘোর কাটাইতে সক্ষম হইত! কিন্তু তা কী করিয়া সম্ভব, যখন স্বয়ং তাহার স্ৃষ্টিকর্তা অবধি সেই মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন?

দীনবন্ধুর শিল্পসৃষ্টির ঐ একটা সংকট! তিনি এমন-সব আপাদমস্তক জীবন্ত **witty** চরিত্র সৃষ্টি করিতেন যে শেষ পর্যন্ত তাহারাই স্রষ্টার চরিত্রভ্রংশের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। একটি চরিত্রের খাতিরে, সমস্ত চরিত্রগুলি যে-উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্ট লেখক তাহাই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, গল্প আর 'সমে' পৌঁছিত না, অর্ধপথে মাতলামি করিয়া পূর্ণতার অবকাশে বাধা জন্মাইত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, সহৃদয়তা দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ গুণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। ঐটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণ, আবার শ্রেষ্ঠ দোষ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শ্রেষ্ঠ বিপদ। জীবন্ত চরিত্রের খাতিরে গল্পের সমগ্রতাকে নষ্ট করিয়া দিতে দীনবন্ধুর জুড়ি নাই।

তাঁহার সৃষ্ট পুরুষচরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিমে দত্ত, তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন; আর এই দুটি শ্রেষ্ঠ নরনারী যে-নাটকে বর্তমান সেই 'সধবার একাদশী' যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা তাহা বলাই বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যে নির্মম রচনার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। নির্মম রচনা বলিতে বুঝি সেই শ্রেণীর রচনা যাহাতে লেখক সম্পূর্ণ মমত্ববোধহীন হইয়া গল্পের নির্দিষ্ট পথে রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন— ঘোড়ার পদাঘাতে পথিককে পীড়িত হইতে দেখিয়াও রাশ টানেন নাই, গাড়ির টান সামলাইতে গিয়া আরোহীকে ব্যস্ত

হইতে দেখিয়াও দয়া অনুভব করেন নাই, লেখক নির্লিপ্ত স্রষ্টার মতো আপন সৃষ্টির নিয়মে আপনি বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করিয়াছেন যে-সব গল্পে বা নাটকে —তাহাই নির্মম সাহিত্য। মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় নির্মম সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ঐ জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত। কেহ-কেহ কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু এবং রোহিণীর হত্যাকে ব্যতিক্রম মনে করিবেন, ঐ ব্যাপারে গল্পের নিয়তির চেয়ে লেখকের অভিরুচি যেন অধিকতর প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' কতকাংশে নির্মম সাহিত্য, সম্পূর্ণত নয়; কেননা বিনোদিনীর স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' নিতান্তই নির্মম।

যেমন নির্মম রচনা আছে তেমনি নির্মম চরিত্র আছে, কেননা একটা নহিলে আর-একটা হয় না। দীনবন্ধুর কাঞ্চন নির্মম চরিত্রের শিরোমণি, নিষ্ঠুর বলিয়া নির্মম নয়, নির্মম বলিয়াই সে নিষ্ঠুর; কামিনী-কাঞ্চনের এ-বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত আর আছে কি! কাহারো প্রতি তাহার আকর্ষণ নাই, কিছুতেই তাহার মোহ নাই, কামসাধনার সিদ্ধির ফলে কামকেও সে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে—তাহার কামকলায় একেবারেই 'কামগন্ধ নাহি', কামসাধনায় এক্ষণে সে সম্পূর্ণ নিষ্কাম, তাই সে অটলের জীবনে যেমন সহজে আসিয়াছিল তাহার জীবন হইতে তেমনি অনায়াসে বিনা-নোটিশে চলিয়া গিয়াছে— এমনি কত জনের জীবন হইতে আগম-নির্গম অভ্যাসের ফলে তবে সে আশ্চর্য সিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছে।

অটলের জীবন হইতে তাহার বিদায় একেবার বিনা-নোটিশে ঘটিয়াছে। এই ব্যাপারে দীনবন্ধু যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। সকলেই ভাবিতেছে সে এখনই ফিরিবে, অটল ও নিমে দত্তও তাহার পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী— কিন্তু আর সে ফিরিবে না, মাসোহারা বাড়াইয়া দিলেও ফিরিবে না, কারণ ফিরিবার কারণ নাই, যেমন আসিবারও কোনো কারণ ছিল না। ঐখানেই নির্মম চরিত্রটির নির্মমতম প্রকাশ।

রোহিণী

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা স্থায়ী অভিযোগ আছে, তিনি নাকি রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই এ-অভিযোগ উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন : 'অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন— "রোহিণীকে মারিলেন কেন ?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমার ঘাট হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যামাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাসপাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।'

আধুনিক কালে শরৎচন্দ্র নূতনভাবে প্রশ্নটা তুলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের মুখে এ-প্রশ্ন বিস্ময়কর, কারণ তিনি নিজে প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক, কল্পনারাজ্যের নরনারীর চরিত্র কোন্ উপাদানে সৃষ্ট হয়, কেন তাহারা একটি বিশেষ পরিণামে গিয়া পৌঁছায়, তাহা শরৎচন্দ্রের না জানিবার কথা নয়। শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের অনুষঙ্গরূপে আরও অনেকে সমস্যাটি লইয়া কলমবাজি করিয়াছেন। কিন্তু এক বিষয়ে সকলে অভিন্নমত— বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। যাঁহারা ইহার বিপক্ষে বলিয়াছেন, তাঁহারাও পরোক্ষ অভিযোগটা গ্রহণ করিয়াছেন— অভিযোগ অস্বীকার করিলে বিচারে নামিবার আবশ্যকই হয় না।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার আগে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি ও মমত্বের অভাব ছিল না, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সংস্করণান্তরে উত্তরোত্তর রোহিণীর প্রতি লেখকের আকর্ষণ বাড়িয়াছে বই কম নাই :

'বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী ও গোবিন্দলাল চরিত্র পরবর্ত্তী কালে পুস্তক-প্রকাশের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতি আছে। বঙ্গদর্শনের রোহিণী দুশ্চরিত্রা, লোভী। প্রথম সংস্করণের রোহিণী প্রায় তাই, দুশ্চরিত্রতা ও লোভ একটু কম দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে রোহিণী আশ্চর্য্য রকম বদলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রের সংযম ও দৃঢ়তা নাই বটে, কিন্তু

দুশ্চরিত্র নয়, লোভী মোটেই নয়। শেষ পর্য্যন্ত রোহিণী তাহাই আছে।"[১]

এই বিশ্লেষণে বোঝা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অকরুণ ছিলেন না। কিন্তু ইহাতে আসল প্রশ্নের উত্তর হইল না। প্রশ্নটার উল্লেখ আগেই করিয়াছি— বঙ্কিমচন্দ্র কি রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন ? দুই পক্ষেই লোক আছে, স্বভাবতই রোহিণীর পক্ষেই সংখ্যার আধিক্য ; কিন্তু আমি প্রশ্নটাকে অস্বীকার করি, আমি বলি এই যে, কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অবিচারের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। যখনই একটি সার্থক চরিত্র সৃষ্ট হইল সেই মুহূর্তেই সে লেখক-নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। রোহিণী কোনোক্রমেই বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে নিম্নতর স্তরের জীব নহে, যদিচ সে বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি— ইহাই সৃষ্টিরহস্য, ইহাই শিল্পরহস্য, ইহাই সার্থক শিল্পসৃষ্টির রহস্য। রোহিণী যদি সজীব, স্বনিষ্ঠ, স্বকীয় ব্যক্তিত্বশালিনী জীব না হইয়া একটা বাক্য-রচিত পুতুল মাত্র হইত, তবে লেখকের বিচার-অবিচারের প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারিত। কিন্তু সার্থক কল্পনা লেখকের হাত হইতে মাটিতে নামিবামাত্র সে লেখকের হাতের বাহিরে চলিয়া যায়— তখন লেখক ইচ্ছা করিলেও আর তাহাকে স্বেচ্ছামতো চালনা করিতে পারেন না, বিচার-অবিচারের প্রশ্ন তো দূরবর্তী।

বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অবিচার করিবেন কীরূপে ? তাঁহাদের জগৎ তো এক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব জগতের লোক, রোহিণী অধিবাসী শিল্পজগতের। একটা গাছের ডাল মাথায় ভাঙিয়া পড়িলে বলি না যে, গাছটা আমার প্রতি অবিচার করিল, ঝড়ে চাল উড়িয়া গেলে তাহার প্রতি অবিচারের দায়িত্ব তুলি না। উদ্ভিদজগৎ ও প্রকৃতির জগতের সহিত আমাদের মানবজগৎ যে এক নয়। শিল্পজগতের এক ব্যক্তি শিল্পজগতের অপর ব্যক্তির প্রতি অবিচার করিলে করিতে পারে— কিন্তু ভিন্ন জগতে বাস করিয়া অবিচার করা কীরূপে সম্ভব ? মঙ্গল-গ্রহের কোনো অধিবাসীর ইচ্ছা থাকিলেও তো পৃথিবীর অধিবাসীর উপরে অবিচার করিবার উপায় নাই। তবে এ-কথা বলিতে পারি যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি অবিচার করিয়াছে, কিংবা কৃষ্ণকান্ত তাহার প্রতি সুবিচার করে নাই। এ-অভিযোগ সত্য না হইলেও সম্ভব, কেননা তাহারা সকলেই

১ কৃষ্ণকান্তের উইল, পরিষৎ সংস্করণ, ভূমিকা

একই শিল্পলোকের অধিবাসী। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ-কেহ অভিযোগ তুলিয়াছেন— কিন্তু এ-অভিযোগ কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে উঠিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। একই কারণে অনুরূপ অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে ওঠা সম্ভব নয়।

বিচারের প্রশ্ন আদৌ যদি ওঠে তবে বলিতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রতি অবিচার করেন নাই, কেননা তাহা অসম্ভব; এই কাহিনীতে একজনের প্রতি সত্যই অবিচার হইয়াছে: সে গোবিন্দলাল, আর সে-অবিচারের কর্তা রোহিণী। রোহিণীকে পাইবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দলালকে যে-ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় রোহিণী কী ত্যাগ করিয়াছে? রোহিণীর সংসারে সুখ ছিল না, কাজেই সংসার ত্যাগ করিয়া তাহার দুঃখিত হইবার কথা নয়। সতীধর্ম বলিয়া তাহার কিছু ছিল না। যাহা নাই তাহা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনেকে নারীধর্মের তর্ক তুলিতে পাবেন— সে-উত্তর পরে দিতেছি। রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত গোবিন্দলালের অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে —'রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি বোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর, —জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর— তাহা পরিত্যাগ করিলাম?'

এত ত্যাগের মর্যাদা কি রোহিণী বুঝিয়াছিল? বুঝিলে রাসবিহারীকে একবার দেখিবামাত্র অভিসারে ধাবিত হইত না। রোহিণীর অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তাহার নিজের বাক্যই সন্দেহভঞ্জন করিবে—

'নিশাকর বলিল, আমি রাসবিহারী।

'রোহিণী বলিল, আমি রোহিণী।

'নিশা। এত রাত্রি হলো কেন?

'রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারি নে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

'নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

'রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।'

ইহার পরে আর কাহারো সংশয় হওয়া উচিত নয় যে, সে রাসবিহারীর নিকটে হরিদ্রাগ্রামের সংবাদ লইতে আসিয়াছিল। রোহিণীকে কুলটা বলিলে কুলটার অমর্যাদা হয়, কারণ তাহারও আচরণের একটা অলিখিত নিয়ম আছে। রোহিণীর আচরণ যদি অবিচার না হয় তবে অবিচার আর কাহাকে বলে? ইহার পরে গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীকে হত্যা অবিচারও নয় সুবিচারও নয়। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। সংসারে এমন হইয়া থাকে— ইহার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র দূরের কথা বিধাতারও হাত নাই।

এবারে মাতৃত্বের তর্কে প্রবেশ করা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, রোহিণীর সংসারসুখ বলিয়া কিছু ছিল না, তাহার বৈধব্যের জন্য সে দায়ী নয়— অথচ দণ্ড তাহাকেই একাকী ভোগ করিতে হইতেছে; তাঁহারা বলেন, রোহিণীর নারীত্ব বা নারীজীবন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু যে-জীবন সে বাছিয়া লইল তাহাতেই কি নারীত্বের সার্থকতা! নারীত্ব বলিতে মাতৃত্বের চেয়ে ব্যাপকতর সংজ্ঞা বোঝায়। বিধবা রোহিণীর মাতৃত্বের আশা ছিল না সত্য এবং নিশ্চয়ই সে-আশায় কুলটা-জীবন সে অবলম্বন করে নাই। মাতৃত্ব নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, যে-হতভাগিনী কোনো কারণে সে-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইল, নারীজীবনের অন্যান্য বৃত্তির চর্চা করিয়া সার্থকতা অর্জন করিতে তাহার বাধা নাই। রোহিণীরও বাধা ছিল না। আসল কথা, তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে গোবিন্দলাল মুগ্ধ হইয়াছে এবং সমালোচকের দলও কম মুগ্ধ হয় নাই। ইহাতেই যত বিপত্তি। পাঠকেরও মোহের কারণ তাহার সৌন্দর্য। কোনো পাঠিকা রোহিণীর প্রতি অবিচারের তর্ক মনে পোষণ করে কিনা জানি না, কারণ নারী নারীর পদস্খলন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না, বিশেষ সে-হতভাগিনী যদি রোহিণীর ন্যায় রূপশালিনী হয়।

মনোরমা

ব ঙ্কি ম চ ন্দ্রে র 'মৃ ণা লি নী' উপন্যাসের মনোরমা-চরিত্র অনন্যসাধারণ। মনোরমার চেয়ে অধিকতর সজীব ও বাস্তবতর চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক আছে, মৃণালিনীর আগেও আছে, পরেও আছে, কিন্তু ঠিক মনোরমার মতো চরিত্রসৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র আর করেন নাই। মৃণালিনীর আগেও করেন নাই, পরেও করেন নাই। এই চরিত্রের গঠনপ্রণালী আর-সকলের হইতে স্বতন্ত্র। মনোরমার চরিত্র বিষমধাতুতে গঠিত। সে একই সঙ্গে বালিকা এবং প্রৌঢ়া, সে একই সঙ্গে বালিকার সরলতা এবং প্রৌঢ়ার অভিজ্ঞতায় মিশ্রিত। আগের মুহূর্তে বালিকার সরলতায় মুগ্ধ করিয়া পরের মুহূর্তে প্রৌঢ়ার অভিজ্ঞতায় সে বিস্মিত করিয়া দেয়। মনোরমা একই দেহে দ্বৈতব্যক্তিত্বশালিনী। পাঠকের বোধসংগতির উদ্দেশ্যে কতক অংশ উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

হেমচন্দ্র জনার্দন-গৃহে মনোরমাকে প্রথম দেখিতেছেন—

'হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণকৌশল-সীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

'বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।'

প্রথম সাক্ষাতে হেমচন্দ্রের সহিত তাহার যে-কথোপকথন হইল তাহাতে হেমচন্দ্র বুঝিল মনোরমা বালিকা। মনোরমার সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবার সঙ্গে-সঙ্গে মনোরমার প্রকৃতি হেমচন্দ্রের কাছে 'অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, তাঁহার বয়ঃক্রম দুরনুমেয়, সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাম্ভীর্য্য-শালিনী দেখিতেন।'

আগের মুহূর্তে হেমচন্দ্রের সহিত বালিকার ন্যায় আলাপ করিয়া পরমুহূর্তে মনোরমা যবনযুদ্ধে তাহার পথপ্রদর্শক হইতে চাহিল। হেমচন্দ্রের হতবুদ্ধি ভাব

দেখিয়া মনোরমা বলিল— 'আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?' হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিল— 'মনোরমা কি মানুষী?'

মনোরমার সম্বন্ধে এই সংশয় কেবল অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ হেমচন্দ্রকে আশ্রয় করে নাই, তীক্ষ্ণদর্শন রাজমন্ত্রী পশুপতিকেও অবলম্বন কবিয়াছিল। তাহার অকস্মাৎ ভাবান্তর দেখিয়া পশুপতি বলিতেছে— 'তোমাব দুই মূর্ত্তি— এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা— সে মূর্ত্তিতে কেন আসিলে না?— সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমাব এই মূর্ত্তি গম্ভীবা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী— এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।'

মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হেমচন্দ্রকে প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোরমা যে উপদেশ দিয়াছে তাহা কোনো বালিকাতে সম্ভব নয়, এমনকি কোনো প্রৌঢ়াতেও সম্ভব নয়, কেবল অসামান্য মানবমনোজ্ঞা প্রতিভাশালিনী নাবীতেই তাহা সম্ভবে। সে নিজের দুর্নিবাব প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিতেছে— 'আমি অবলা; জ্ঞানহীনা; বিবশা; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।'

এখানে একনিশ্বাসে কথিত উক্তির মধ্যে মনোবমার দ্বৈতব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। প্রথম বাক্যটিতে সে বালিকা। দ্বিতীয় বাক্যটি তত্ত্বদর্শী অভিজ্ঞা ব্যতীত কে বলিতে পারিত? ক্ষুব্ধ হেমচন্দ্র তাহাকে কিছু সদুপদেশ দিল— এমন সময়ে মনোরমা তাহার হাতের ঢালখানি লক্ষ্য কবিয়া শুধাইল— ' "ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামডা?" হেমচন্দ্র হাস্য কবিলেন। মনোবমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা!'

মনোরমা পশুপতিব পূর্বপরিণীতা পত্নী। পশুপতির মৃত্যু হইলে স্বামীর চিতায় সে সহমৃতা হইল।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পাবে, এই দ্বৈতব্যক্তিত্বের ভান কি মনোরমার একটি মনোরম ছলনা মাত্র? কিন্তু কী উদ্দেশ্যে, কাহাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে সে ছলনা করিতে যাইবে? ঘটনার তাগিদ এমন নহে যে তাহাকে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ছদ্ম-বেশ ধারণ করিতে বাধ্য করিবে। আর এমন কোন্ ছলনা আছে যে, সারা জীবনে ধরা পড়ে না? আর সারা জীবনে যদি ধরাই না পডিল তবে তাহাকে ছলনা বা ছদ্মাভিপ্রায় বলিতে যাইব কেন? অতএব এই দ্বৈতব্যক্তিত্বকে তাহার

প্রকৃতিগত বলিয়া ধরিয়া লওয়াই উচিত।

আগে বলিয়াছি যে, এমন দ্বৈতব্যক্তিত্বশালী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আর সৃষ্টি করেন নাই। কপালকুণ্ডলা-চবিত্রে ইহার একটা আভাস আছে। কিন্তু সে আভাস মাত্র। কাপালিক-আশ্রমেব কপালকুণ্ডলা বালিকা। নবকুমারের পত্নী আর বালিকা নয়— সে অচিরে পূর্বতন স্বভাব ও সরলতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে-দ্বৈতচরিত্র অঙ্কনের প্রথম ক্ষীণ এবং অনিশ্চিত চেষ্টা কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে, তাহারই পূর্ণ পরিণতি মনোরমায়। পূর্ণ পরিণতিকে পূর্ণতর করিবার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র কবেন নাই— সুবুদ্ধিব কাজই করিয়াছেন। শিল্পজগতে পুনরাবৃত্তির ন্যায় দোষ অল্পই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক উপন্যাসে একজোড়া করিয়া প্রধান স্ত্রী-চরিত্র আঁকিয়াছেন স্বভাবে যাহাদের প্রায় বিপরীত বলা যায়। তাহাদের একজন গম্ভীরা, অপরা সরলা, একজন কোমল তরলা, অপরা আপনাতে আপনি বিধৃত, একজন সংসার-বিষবৃক্ষের কম্পমান পত্রশীর্ষে সদ্যঃপাতী শিশিরবিন্দু, অপরা সংসারের হিমনিশ্বাসে শিশিরবিন্দুর কঠিনীভূত রূপ ; দুটিই সুন্দর, কিন্তু দুটির সৌন্দর্যে প্রভেদ আছে— একজন সংসারের আঘাতে মুমূর্ষু, অপরজন মরিবার আগে শেষবারের জন্য সংসারকে চরম আঘাত কবিয়া লইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘দুর্গেশনন্দিনী’র তিলোত্তমা ও আয়েষার, এবং ‘কপালকুণ্ডলা’র কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার ‘বিষবৃক্ষে’র কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, ‘আনন্দমঠে’র কল্যাণী ও শান্তি, ‘সীতারামে’র নন্দা ও শ্রী— সকলেই উক্ত রীতির উদাহরণস্থল।

মৃণালিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্র রীতি অবলম্বন করিয়া একটি চরিত্রের মধ্যেই দুটি ধারাকে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই মনোরমাকে দেখি একাধারে বালিকা ও প্রৌঢ়া, সরলা ও অভিজ্ঞা, অবোধ ও প্রতিভাশালিনী। তাই সবসুদ্ধ মিলিয়া সে রহস্যময়ী। হেমচন্দ্র ও পশুপতির নিকট সে যেমন প্রহেলিকাময়ী, পাঠকের কাছেও তেমনি প্রতিভাত হোক— ইহাই বোধকরি লেখকের অভিপ্রায় ছিল। যদিচ বাস্তবের মাধ্যমে দেখায় এবং শিল্পের মাধ্যমে দেখায় অনেক প্রভেদ। বাস্তবের মাধ্যমে কেবল অংশকে দেখি, শিল্পের মাধ্যমে দেখি পূর্ণকে, বাস্তবের মাধ্যম প্রকাশ করে রূপকে আর শিল্পের মাধ্যম প্রকাশ করে স্বরূপকে। বাস্তবের মাধ্যমে হেমচন্দ্র ও পশুপতি কেবল মনোরমাকেই

দেখিয়াছে, শিল্পের মাধ্যমে পাঠক মনোরমা-চরিত্রের পরিপূরকভাবে তাহার স্রষ্টার অভিপ্রায়কেও দেখিতে পায়। কাজেই হেমচন্দ্র ও পশুপতির দৃষ্ট মনোরমার চেয়ে পাঠকের দৃষ্ট মনোরমা পূর্ণতর।

আগে যে-সব যুগ্ম নায়িকার উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের হৃদয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, পথ যতই কঠিন হোক সেই পথকেই তাহারা বাছিয়া লইয়াছে। সূর্যমুখী জানে কোন্‌টি তাহার পথ, আবার কুন্দনন্দিনীর পথ স্বতন্ত্র হইলেও সেই পথের শেষ শিলাখণ্ড পর্যন্ত তাহাকে যে যাইতে হইবে সে-বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। শান্তি ও শ্রী—দু-জনেরই পথ দুর্গম, সেই দুর্গমতার পাথেয় তাহাদের চরিত্রে সুপ্রচুর, দ্বন্দ্বাতীত তাহাদের সংকল্প, তাহাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নাই। মনোরমা এত সৌভাগ্যবতী নহে। সে পশুপতির কাছে ধরা দিতে চায়, কিন্তু একটা বিশেষ অবস্থা ঘটিবার আগে ধরা না দিতে সে বদ্ধপরিকর। পতিপরায়ণতা এবং পতির যথার্থ মঙ্গলকামনা, এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে হতভাগিনী নারী নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-হস্তনিক্ষিপ্ত মাকুর মতো পুনঃ পুনঃ চালিত সঞ্চালিত হইয়া পাঠকের মর্মকোষ-বিনির্গত অগ্নিময় সমবেদনা-সূত্রের যে-দিব্য বসন বুনিয়া তুলিয়াছে তাহা স্বয়ং বীণাপাণির অবগুণ্ঠন হইবার যোগ্য। কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে সামান্য মূল্য দিতে হয় নাই। তাহাকে আত্মভেদ ঘটাইতে হইয়াছে—তাই সে একদেহে বালিকা ও প্রৌঢ়া, সরলা ও অভিজ্ঞা, অবোধ ও প্রতিভাময়ী। খুব সম্ভব এই বিচিত্র দ্বন্দ্ব বীজাকারে তাহার প্রকৃতিতে গোড়া হইতেই নিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে আত্মরক্ষার তাগিদে অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে সযত্নে লালন করিয়া বনস্পতি হইয়া উঠিতে সে সাহায্য করিয়াছে। বিপৎকালে সেই বনস্পতি তাহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে—আবার যেদিন ঝড় আসিল সেই বনস্পতি চাপা পড়িয়াই সে অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছে।

হীরা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র বহু শাখা এবং বহু ফল। উপন্যাসখানির প্রধান নায়ক-নায়িকা সকলেরই ভাগ্যে বিষফলের ভাগ পড়িয়াছে। নগেন্দ্র দত্ত, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, দেবেন্দ্রনাথ ও হীরা কেহই বিষফলে বঞ্চিত হয় নাই। হীরা অপর চারজনের মতো মূলত প্রধান চরিত্র নয়—কিন্তু বিষফলের প্রতিক্রিয়ার ঘটনাবর্তে পড়িয়া এই সামান্যা নারী অসামান্যা হইয়া উঠিয়াছে। হীরা দত্তবাড়ির দাসী—কিন্তু বিষের এমনই প্রভাব যে, গ্রন্থের উপসংহারে বেদনার মহিমায় সে দত্ত-গৃহিণীর চেয়েও উজ্জ্বলতর মূর্তি ধরিয়াছে। বাস্তবিক, একমাত্র হীরার ভাগ্যেই বিষফল অমিশ্র ক্রিয়া করিয়াছে—কোনো দিক হইতে একবিন্দু সান্ত্বনার অমৃত তাহার ভাগ্যে জোটে নাই।

সূর্যমুখী পুনরায় নগেন্দ্রের প্রণয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নগেন্দ্র সূর্যমুখীর প্রণয় ও বিশ্বাস কখনো হারায় নাই, কুন্দনন্দিনী সার্থকতার শিখরে উঠিয়া মৃত্যুর আগ্নেয় দিগন্তরে চলিয়া পড়িয়াছে, এমনকি নিষ্ঠুর দেবেন্দ্রনাথের প্রতিও লেখক অকরুণ নন—মৃত্যুর তিরস্করণী তাহার সমস্ত প্রদাহ ও ব্যর্থতা ঢাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু হীরার ভাগ্যে কী হইল? দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায়, গ্রন্থের শেষতম অধ্যায়ে তাহাকে দেখিতে পাই—'তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।' তাহাকে দেখিয়া মুমূর্ষু দেবেন্দ্র ভাবিল এ কোনো উন্মাদিনী। 'উন্মাদিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।" দেবেন্দ্র শুধাইল, "তোমার এমন দশা কে করিল?" হীরা রোষদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশন করিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল—"তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু একদিন আমার খোসামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু একদিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া··· গাহিয়াছিলে—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"'

দেবেন্দ্র মরিল, শান্তি পাইল। কিন্তু হতভাগিনী হীরার ভাগ্যে শান্তি মিলিল না! 'দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কতদিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে স্ত্রীলোক গায়িতেছে—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।'

সংসার-বিষবৃক্ষের বিচিত্র নিয়ম। কে বীজ বপন করে, কে অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে, কে বিষফল চয়ন করে—আর বিষফল কাহার ভাগ্যে নিদারুণ নিয়মিত অমোঘ শরসন্ধান করিয়া বসে! এমন যে সতত-প্রত্যক্ষ মৃত্যু, সে-ও তাহার কাছে ঘেঁষে না! হীরার ভাগ্যে নির্মম অদৃষ্ট বেদনার পাত্র উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে! শিল্পীরা এমন নির্মম কেন? নির্মমতা যে সৃষ্টির ভূমিকা! বাটালির আঘাত নহিলে কি পাষাণে মূর্তি ফোটে?

অনেক সমালোচক রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমবেদনার অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হীরার তুলনায় রোহিণীকে সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবে।

হীরার অনুরূপ আরও দুটি নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বউ-ঠাকুরানীর হাটে'র রুক্মিণী এবং শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী। ইহাদের দু-জনেরই প্রেমের শরসন্ধান ব্যর্থ হইয়াছে—সেই ব্যর্থ শর ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদের চিত্ত ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে—তখন তাহাদের শুভাশুভ জ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত। তাহাদের ব্যর্থ প্রেম ভগ্নস্তম্ভ অট্টালিকার মতো প্রণয়ীর মাথায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে—অবশেষে তাহারা হীরার মতোই উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

যশোরের যুবরাজ উদয়াদিত্য বিবাহের পূর্বে রুক্মিণীর প্রেমে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইয়াছিল। বিবাহের পরে সে-মোহ তার সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছিল। রুক্মিণী কিন্তু উদয়াদিত্যের আশা ছাড়ে নাই। সে ভাবিয়াছিল, উদয়াদিত্যকে হাত করিয়া তাহার হৃদয় এবং যশোরের সিংহাসনের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিবে। কিন্তু সে দেখিল সে-আশা সহজে সফল হইবার নয়—অন্তত যুবরাজপত্নী সুরমা জীবিত থাকিতে নয়। সুরমা বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল—সে-বিষ রুক্মিণী-

প্রদত্ত। এখানে হীরা কর্তৃক কুন্দকে বিষদানের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। সুরমার মৃত্যুর পরে সে ভাবিয়াছিল, তাহার পথ সুগম হইবে। কিন্তু উদয়াদিত্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তখন রুক্মিণীর ব্যর্থ প্রেম নিদারুণ মূর্তি ধরিল। তারপর যখন প্রতাপাদিত্যের ক্রোধে উদয়াদিত্যের বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন এই হতভাগিনী নারী প্রতাপাদিত্যের প্রতিহিংসার যন্ত্র হইয়া উঠিল। সে নৈরাশ্যে জলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিল, মরিলেই কি শান্তি পাইবে ? সে বুঝিল, উদয়াদিত্যের সর্বনাশ ব্যতীত তাহার হৃদয় শান্ত হইবে না। উদয়াদিত্য যশোর পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলে তবে তাহার ক্রোধ পড়িল। ক্রোধ পড়িল— কিন্তু সে আর শান্তি পাইল না। সে উন্মাদিনী হইয়া গেল।

রুক্মিণী-চরিত্র দেখিলে মনে হয়, তাহাকে চিত্রিত করিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হীরার চরিত্রটি ছিল। অবশ্য রুক্মিণী-চরিত্র হীরার ন্যায় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত নয়। কিন্তু সে যে হীরার ছায়া তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সে ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট, আবার ছায়ার মতোই সত্য।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ী-চরিত্র অঙ্কনের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে হীরার ছবি উপস্থিত ছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে এ-দুটি চরিত্রের ছকে সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। কিরণময়ী বিধবা হইবার পরে উপেন্দ্রকে দেখিল। উপেন্দ্রকে ভালোবাসিল। উপেন্দ্র পত্নীগতপ্রাণ, কিরণময়ী বুঝিল উপেন্দ্রকে পাইবার আশা নাই। তাহার ব্যর্থ প্রেম ক্রোধে পরিণত হইল। সে উপেন্দ্রকে আঘাত করিবে। কিন্তু তাহার উপায় কী ? তখন সে উপেন্দ্রের প্রিয়পাত্র দিবাকরকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাহাকে লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইয়া গেল। বেচারা দিবাকরের ধারণা হইয়াছিল কিরণময়ী তাহাকে ভালোবাসে। সে কখনো কিরণময়ীর ভালোবাসা পায় নাই, ভালোবাসার ভানমাত্র পাইয়াছিল। এদিকে কিরণময়ীর মন শূন্যতায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে এই নিদারুণ শূন্যতায় তাহার বুদ্ধির ভারসাম্য বিচলিত হইল। দেশে ফিরিবার পরে সে পাগল হইয়া গেল, পাগল হইয়া পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানেও দেখি হীরার চরিত্রের ছাঁচ। প্রেমব্যর্থতা, ক্রোধ, এবং অবশেষে উন্মাদ-অবস্থা।

চরিত্র-তিনটির মধ্যে হীরার ন্যায় হতভাগিনী কেহ নয়। হীরা এক নৃশংস

পাষণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্র জানিয়া শুনিয়া বেশ সুস্থ মেজাজে হিসাব করিয়া হীরার সর্বনাশ করিয়াছিল— সর্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই করিয়াছিল। উদয়াদিত্য বা উপেন্দ্র সম্বন্ধে ইহা আদৌ প্রযোজ্য নহে।

মানুষের বংশলতিকার মতো কাল্পনিক নরনারীরও বংশলতিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে হীরা, রুক্মিণী ও কিরণময়ীকে একই ভাবগোষ্ঠীর মেয়ে বলা যাইতে পারে। আবার ভাঁড়ু দত্ত ও হীরা মালিনী একই বংশের লোক; দেবযানী ও বাঁশরি সরকার দেহান্তরে সমান রক্তধারা বহন করিতেছে। নৃতাত্ত্বিক যেখানে বাস্তব রক্তধারায় ঐক্যসন্ধান করে, সাহিত্য-সমালোচককে সেখানে কাল্পনিক রক্তধারার ঐক্যসন্ধান করিতে হয়। আর, একবার রক্তের ঐক্য খুঁজিয়া পাইলে জাতিগত চরিত্রের রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে।

ইন্দিরা

বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন— কারণে, অকারণে, বা স্বল্প কারণে হাসির তরঙ্গ তাহাদের চিত্তে ঝলমল করিয়া ওঠে। ঈষৎ মুখর, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রশ্নোত্তরকুশলা এইসব রমণী সূর্যকিরণপ্রদীপ্ত হাসির কবচকুণ্ডল ধারণ করিয়াই জন্মিয়াছে। তাহারা যে সুখী এমন নয়, অপরের চেয়ে অধিকতর সুখী তো নয়ই, তাহাদের অনেকেরই দুঃখের ভরা পূর্ণ, কিন্তু হাসির বাত্যায় তাহা ডুবিবার লক্ষণ প্রকাশ করে না, বরঞ্চ সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া সংসারতরঙ্গ দ্বিধা কাটিয়া ছুটিয়া চলে। লঘু হাস্যই তাহাদের স্বভাবের ধর্ম। অদৃষ্টের নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণকে তাহারা হাসির উজ্জ্বল ফলকখানি দিয়া প্রতিরোধ করে —হাসি তাহাদের আত্মরক্ষার উপায়। মৃণালিনীর গিরিজায়া, বিষবৃক্ষের কমলমণি, দেবী চৌধুরানীর সাগর বৌ, রাজসিংহের নির্মলকুমারী উক্ত রমণীপঙ্ক্তির অন্তর্গত। রজনীর লবঙ্গলতাকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যমণি ইন্দিরা —শুধু নায়িকা ইন্দিরা নয়, সমস্ত কাহিনীটি। এই কাহিনীর নায়িকা হাসিতেছে, প্রতিনায়িকা সুভাষিণী হাসিতেছে, তাহার হারানী ঝি হাসিতেছে, ইন্দিরার বোন

কামিনী হাসিতেছে, সমস্ত কাহিনীটি তাহাদের ওষ্ঠাধর-প্রতিফলিত হাসিতে ঝলমল করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখের কাহিনীটিকে হাসির রুপার তবকে মুড়িয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

ইহা আকস্মিক নয়, লেখকের ইচ্ছাকৃত। ইহার আগে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব কাহিনী লিখিয়াছেন সবই দুঃখের কথায় পূর্ণ। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ— সবই জীবনের ট্র্যাজেডির অভিব্যক্তি। দুঃখের স্তূপীকৃত ভারে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বোধকরি ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, বোধকরি একটি আলোকরশ্মির আবির্ভাবের আশা তাঁহার মনে জাগিতেছিল, বোধকরি নন্দন-লোক হইতে সদাফুল্ল নন্দিনী তাঁহার চিত্তলোকে অবতীর্ণ হোক ইহাই তাঁহার ধ্যানের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই আশা ও ধ্যানের সফলতা ইন্দিরা।

এটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত, তার প্রমাণস্বরূপ তিনি ইন্দিরা উপন্যাসের মুখবন্ধে শেলির 'স্পিরিট অব্ ডিলাইট' কবিতা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। সেই কয়েক ছত্রের অনুবাদ দেওয়া গেল—

কদাচিৎ তুমি দাও দেখা
হে নন্দিনী,
বহুদিন আমি আছি একা
তোমায় বিনি।
বহুদিন ওগো বহু রাত,
হয় নি মিলন তব সাথ।
মোর মতো জন তোমা ফিরে
পাবে কি আর।
সুখী সনে মিলে দুঃখীরে
ধারো না ধার।
নিষ্ঠুরা তুমি মনে রাখো
যারা কভু তোমা স্মরে নাকো।...
হে প্রেম, জীবন এসো ফিরে
পুনরায় এই হৃদি-নীড়ে॥

যে-কারণেই হোক এই সময়টাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে 'স্পিরিট অব্ ডিলাইট'

বা নন্দিনীর জন্য একটা তৃষ্ণা জাগিয়াছিল। সেই তৃষ্ণা নিরসনের উদ্দেশ্যে কল্পনার শরাঘাতে আপন চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছল ভোগবতী-বারি তিনি নির্গত করিয়াছিলেন, তারপরে আপনি পান করিয়া সোনার ভৃঙ্গার ভরিয়া পাঠকের উদ্দেশে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ এই তৃষ্ণার কারণ কী? একটি কারণ আগেই বলিয়াছি, অনেক দুঃখের কাহিনী লিখিয়া বোধকরি তাঁহার মন পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। আরও একটা কারণ থাকিতে পারে, কিংবা ইহাকেও পূর্বোক্ত কারণের আনুষঙ্গিক রূপে দেখা চলিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন মনীষী ছিলেন, কল্পনাগম্ভীর ধীশক্তি যেমন তাঁহার ছিল, গভীর মানব-মনোজ্ঞতার অধিকারী যেমন ছিলেন, তেমনি প্রাণপ্রাচুর্যজাত উচ্ছল রহস্যপ্রিয়তাও তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ— লোকরহস্য তাহারই সামান্য পরিচয়। ইন্দিরা-পূর্ব উপন্যাসগুলিতে প্রতিভার এই ধারণাটা তেমন প্রশ্রয় পায় নাই, অথচ ভিতরে-ভিতরে বেগ সঞ্চয় করিয়া তাহা অধীর হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে দুর্বলতার সামান্য সুযোগ পাইবামাত্র ট্র্যাজেডির পাষাণের বাঁধটাকে ভাঙিয়া ডিঙাইয়া ছুটিতে-ছুটিতে, হাসিতে-হাসিতে পাঠকের চোখেমুখে অজস্র শুভ্র হাস্যের ফেনমল্লিকা নিক্ষেপ করিতে করিতে দুর্দম দুরন্ত 'স্পিরিট অব্ ডিলাইট' আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাই ইন্দিরার স্বরূপ-পরিচয়— তাহাকে কেহ দমাইতে পারে নাই, না ডাকাত, না দুর্জন, না দুঃখ, না 'কালীর বোতল'! ঐ হাসি তাহাকে সমস্ত বিঘ্ন উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে! বিধাতা যাহাকে রক্ষা করিবেন সংসারের অশ্রু-বৈতরণীতে তাহার জন্য হাসির সোনার তরীর ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কাহিনীর সূত্রপাতেই লেখক ইন্দিরার স্বভাবের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। অনেকদিন পরে ইন্দিরার হঠাৎ-বড়োমানুষ শ্বশুর তাহাকে লইতে ঘটা করিয়া পালকি-বেহারা পাঠাইয়াছেন। ইন্দিরার পিতা বলিতেছেন, 'মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।'

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে পিতা কন্যার স্বভাব জানিত। ইন্দিরার ছোটো বোন কামিনী 'শ্বশুরবাড়ি কেমন' তাহার এই প্রশ্নের দিদির উত্তর শুনিয়া হাসিয়া বলিল, 'মরণ আর কি!' দিদি শ্বশুরবাড়ি চলিল— কোথায় সে একটু চোখের জল ফেলিবে, না সে-সময়েও কামিনীর হাসি! ইন্দিরার বোন বটে তো! এ গেল

উপন্যাসের সূত্রপাত। আর উপসংহারেও দেখি সেই একই অবস্থা। 'সেকালে যেমন ছিল' অধ্যায়ে সেকালিনীগণের সুযোগ্য প্রতিনিধিরূপে একালিনীগণ হাসির মজলিশ তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছে। আর কাহিনীর মাঝখানে আছে সুভাষিণী আর তার ঝি হারানীর হাসি। 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ'।

হাসি-কান্নার মধ্যে, হাসিতে যেমন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করে এমন আর-কিছুতে নয়। কোন্ অবস্থায় কে কাঁদিবে তাহা একপ্রকার পূর্বনির্দিষ্ট। কান্নায় দেশে-দেশে কালে-কালে বড়ো ভেদ নাই— দুঃখে মানুষে-মানুষে মিল। কিন্তু কে কোন্ ঘটনায় বা কোন্ কথায় হাসিবে তাহার স্থিরতা নাই। আবার দেশে-দেশে কালে-কালে হাসির বিষয়ে বড়ো প্রভেদ। এক সময়ে মানুষ যে-কথায় হাসিত এখন হয়তো তাহাতে বিরক্তি বোধ করে। দুই দেশের লোক সমানভাবে এক বিষয়ে হাসির বেগ অনুভব করে না। হাসি মানুষের **differentia**। এই কারণেই দেখি অপরের দুঃখে যেমন সহজে সমবেদনা বোধ করিতে পারি, অপরের সুখে তেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারি না, অপরের সুখ আমার সুখ নয়, সুখে মানুষ স্বার্থপর। যাই হোক, যে-কারণেই হোক, হাসিতে হাসিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ— ব্যক্তিত্ব মানেই চরিত্রের সেই বস্তু যেখানে সে অপর হইতে স্বতন্ত্র।

অনেকের হাসি শিউলি ফুলের মতো, ওষ্ঠাশ্রয়ী, একটুতেই ঝরিয়া পড়ে। অনেকের হাসি রজনীগন্ধার মতো দু-এক ফোঁটা শিশিরসম্পাত না হইলে ফুটিতে চায় না, সে-হাসি সদ্যঃপাতী না হইলেও বড়ো ম্লান এবং করুণ, ধরিতে সাহস হয় না, কখন ঝরিয়া পড়িবে। অনেকের হাসি প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের জলন্ত বুদ্-বুদের মতো, কঠিন বৃন্তে বিধৃত এবং তীক্ষ্ণ কাঁটায় সুরক্ষিত। ইন্দিরার হাসি শুভ্র শতদল, 'যৌবনসরসীনীরে' ভাসমান হইলেও তাহার মৃণাল রহিয়াছে ইন্দিরার স্বভাবের সুগভীরে নিহিত, ঐ হাসিতে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশ।

এত কথা যে বলিলাম তার কারণ ইন্দিরা মেয়েটি বড়ো ভালো, অনেক পাঠকেই বোধকরি মনে-মনে উপেন্দ্রবাবুকে ঈর্ষা করিয়া থাকে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে— 'good wife' বিধাতার দান। 'Good wife'-এর কী অনুবাদ করিব? শুধু সাধ্বী বলিলে চলিবে না, সাধ্বী স্ত্রী কর্মকুশলা না হইতে পারে, বুদ্ধিমতী না হইতে পারে, ইন্দিরার মতো হাস্যময়ী না হইতে পারে— এখানে 'good' বলিতে অনেকগুলি গুণকে বুঝাইতেছে; সেইসব গুণের

অধিকাংশই ইন্দিরায় আছে। হিন্দুসমাজের বিচারে ইন্দিরার সব আচরণ 'আদর্শ পত্নী'র যোগ্য না হইতে পারে— না হয় না হোক, কঠিন সংসারপথের সহযাত্রিণীরূপে সে যে good wife তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়া এই good wife-টিকে বিধাতা বাঙালি পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছেন।

লবঙ্গলতা

'র জ নী' উ প ন্যা সে র না য়ি কা কে ? রজনী না লবঙ্গলতা ? পূর্ণিমারজনীর নায়িকা কে ? রজনী না পূর্ণশশী ? চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বলিবে পূর্ণশশী, রসিক পাঠকমাত্রেই বলিবে লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা-অমরনাথের প্রেমকাহিনীর সূত্রে 'রজনী' উপন্যাস গ্রথিত। অনেকে বলিবেন লবঙ্গলতা-অমরনাথের মধ্যে প্রেম কোথায় ? কেবল বিচ্ছেদ আর বিরহ, অর্থাৎ প্রেমের অভাব, তাহাতে আবার মালা গাঁথা সম্ভব কীরূপে! কেন, বিনা সুতায় মালা কি গাঁথে না ? বাস্তবিক 'রজনী' উপন্যাস বিনি-সুতার একটি মালা।

এবারে একটা কঠিন প্রশ্ন শুধাইতে উদ্যত হইয়াছি— পাঠিকাকেই শুধাইব, ধরিয়া লই যে এই নীরস প্রবন্ধেরও অন্তত একজন পাঠিকা আছে। প্রশ্নটি, লবঙ্গলতা অমরনাথকে ভালোবাসিত কি না। আমার পাঠিকা কী উত্তর দিবেন জানি না, তবে লেখকের মতো নারীচরিত্র-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস যে, লবঙ্গলতা অমরনাথকে যত ভালোবাসিত এমন আর-কাহাকেও নয়, সে একদিনের জন্যও, এক মুহূর্তের জন্যও অমরনাথকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহার অন্তরের অন্ধকার গর্ভগৃহে যে-মূর্তি স্থাপিত তাহা অমরনাথের ; মন্দিরের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত তাহার স্বামী রামসদয় মিত্রের মূর্তিটাই সকলের চোখে পড়িত— কিন্তু বাহিরে বলিয়াই কি সে-মূর্তির গৌরব কম নয় ? অবশ্য অন্য মতের সপক্ষে লেখক আছেন, তিনি লবঙ্গকে দিয়া বলাইয়াছেন, 'না— যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে

এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনও হইবে না।'

পাঠিকা বলিতে পারেন লবঙ্গের স্পষ্ট কথার পরে আর অবিশ্বাসের কী কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু স্ত্রীলোকের সব কথা কি বিশ্বাস করিতে হয়? কিংবা স্ত্রীলোকের কথায় মনের সবটা কি কখনো প্রকাশিত হয়? বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীলোকের বিদ্যাকে নারিকেলের মালা বলিয়াছেন— আধখানা বই যাহা দেখা যায় না। এ-তথ্য স্ত্রীলোকের মন সম্বন্ধেও সত্য— আধখানা বই দেখা যায় না, অদৃশ্য আধখানা তাহার নিজের কাছেও অ-দৃষ্ট। লবঙ্গলতা কপটতা করে নাই, মিথ্যা বলে নাই, কেবল যাহা বলিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপটা সে অনবগত। তাহার মনের অ-দৃষ্ট অর্ধ আদিম বিস্মৃতির তলে নিমজ্জিত, তাহাকে সে জানে না, তাই বলিয়া তাহা নাই এমন হইতে পারে না। মানুষের মনের গভীরতম স্তরে আদিম প্রবৃত্তির সমুদ্র, কালক্রমে সমুদ্রের উপরিতলে উদ্ভিদ ও অরণ্য জন্মিয়াছে, অর্বাচীন কাল তাহার উপরে কত সংস্কার, সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্তর জমাইয়া দিয়াছে— কিন্তু সর্বদাই নীচে রহিয়াছে আদিম প্রবৃত্তির সমুদ্র। সেই সমুদ্রে লবঙ্গলতার বাকি অর্ধ মন নিমগ্ন, তাহার সন্ধান সে জানিবে কীরূপে? তাহার মনের সেই গুপ্ত আধখানা দিয়া সে অমরনাথকে ভালোবাসে, আর প্রকাশ্য আধখানার মালিক রামসদয়; রামসদয় তাহার স্বামীমাত্র, অমরনাথ তাহার কাছে পুরুষ; তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, সমস্ত মানবিক সম্বন্ধের আদিমতম বন্ধন। লবঙ্গলতা জানুক আর নাই জানুক, স্বীকার করুক আর নাই করুক, সে একমাত্র অমরনাথকেই ভালোবাসে, যেমন ভালোবাসিত প্রতাপ শৈবলিনীকে। লবঙ্গলতা প্রতাপের নারীমূর্তি।

প্রতাপ ও লবঙ্গলতার প্রেম-স্বীকারের (প্রেমও বটে, স্বীকারও বটে) ভঙ্গিটি অবধি এক।

প্রতাপ রমানন্দস্বামীকে বলিতেছে—

'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি— আমার ভালবাসার নাম— জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে

অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই— মানুষে তাহা জানিতে পারিত না— এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।'

অমরনাথ বিদায় লইতে আসিয়াছে, সে জানাইল যে সে কালকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে—

'লবঙ্গলতা। কেন?

'অমরনাথ। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার কেহ তো নাই।

'ল। যদি আমি বারণ করি?

'অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

'ল। তুমি আমার কে? তা তো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে···

'ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্মে পতিত হইব।

'অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

'ল। না— যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনও হইবে না।

'আবার "ইহলোকে"। যাক্, আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ইষৎ কাঁদিতেছে।'

হায় রে, নিতান্ত অন্ধেও বুঝিতে পারিবে— এ-কথোপকথন প্রণয়ীযুগলের, কোনো কারণে যাহাদের প্রণয় স্বাভাবিক লক্ষ্যে পৌছিতে পারে নাই। কিন্তু অমরনাথের কথাই সত্য, তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে পারিল না— একে তো অপরের মন বোঝা কঠিন, তার উপরে অপরের অবচেতন মন— সে যে এক-প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তাহারা না বুঝুক, পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়! পাঠিকারা বুঝিলেন কিনা তাঁহারাই জানেন।

এমন করিয়া দয়িতকে দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করাইয়া রাখিতে কেবল স্ত্রীলোকেই পারে (অবশ্য সব স্ত্রীলোকে পারে না, ভাগ্যে পারে না !)। তাহারা স্বামী-পুত্র-সংসারকে মনের আধখানা দিয়া পুরা মনের স্বস্তি অনুভব করে, সুখ অনুভব করে কিনা সে-কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তবু যে সংসার চলে, তার কারণ লবঙ্গলতার সমস্যা আর ক-জন নারীর জীবনে ঘটে ? আর সংসারে লবঙ্গলতাই বা ক-জন ? লবঙ্গলতার শক্তি না থাকিলে লবঙ্গলতার সমস্যা মানুষকে পিষিয়া ফেলে। হয় কুলত্যাগ করে নয় প্রাণত্যাগ করে— বিবাহবিচ্ছেদের সুলভ পন্থা তো সমাজে নাই।

কিন্তু লবঙ্গলতার মতো মেয়েরাই শিল্পের সম্পদ। তাহারা মনের আধখানা সংসারের দিকে স্থাপন করে— সংসারের সুখের আলোতে তাহা ভাস্বর হয়— আর বাকি আধখানায় চাপা দুঃখের চিরন্তন অন্ধকার— যেমন আলো-আঁধারে পূর্ণশশী আপনার দুই দিককে চিরদিন ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ণশশীস্বরূপিণী লবঙ্গলতাই 'রজনী'র নায়িকা। তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যেই অন্ধকার রজনী এবং অন্ধ রজনীর সৃষ্টি। রজনীর যখন চোখ ফুটিয়া ভোরের আলো হয়, পূর্ণশশী কি তার আগেই অস্ত যায় না ? উপন্যাসের রজনীর দৃষ্টি পাইবার পরে লবঙ্গলতাকে আর দেখিতে পাই না, সে অস্তমিত, অমরনাথের বিদায়ের দিগন্তে কখন তাহারও বিসর্জন ঘটিয়াছে। গ্রন্থের শেষতম পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতার কথিত সেই 'লোকান্তর'।

অমরনাথ শুধাইয়াছিল—'যদি লোকান্তর থাকে, তবে ?'

লবঙ্গ বলিয়াছিল— 'আমি স্ত্রীলোক— সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে ? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' প্রতাপও প্রায় অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল।

লবঙ্গলতা দুর্বল, দুর্বল বলিয়াই তাহার বলের প্রকাশ মনোহর। অন্তর্লীন দুঃখের তাপে ভাস্বর এমন মনোহর মূর্তি বঙ্কিমচন্দ্র অধিক সৃষ্টি করেন নাই।

কমলাকান্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'কমিক' চরিত্র বলিয়া বর্ণনা করিতে কী আপত্তি থাকিতে পারে জানি না। বাংলা সাহিত্যে কমিক চরিত্রের অভাব নাই, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্ত কমিক, মাইকেলের নববাবু কমিক, দীনবন্ধুর নিমচাঁদ কমিক, রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রবাবু কমিক— এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চরিত্রের ব্যাপকতা, গভীরতা, সজীবতা ও মনীষার হিসাবে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে কমলাকান্ত সকলের সেরা। তা ছাড়া পূর্বোক্ত চরিত্রগুলি অনেকাংশে ছবির মতো, তাহাদের ব্যক্তিত্বে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, গভীরতা নাই, বা অতি সামান্য আছে। কমলাকান্ত-চরিত্র ভাস্করের কীর্তি, তাহার সবটা দেখিতে পাওয়া যায়, পটের মতো কেবল তাহার একটা দিক মাত্র দৃশ্য নহে, তাহাকে প্রদক্ষিণ করা চলে। পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা এক-একটি বিশেষ অবস্থার সহিত সংলগ্ন, ভিন্ন অবস্থায় কী করিত, আমরা জানি না। কিন্তু কমলাকান্ত আজিকার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইলে নিশ্চয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইত না, সপ্রতিভভাবে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিত জানি, তাহার মধ্যে 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র সম্ভাবনা নিহিত। এই কারণেই পরবর্তীকালে একাধিক লেখক কমলাকান্তকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার কারণ কমলাকান্তের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। সে-শক্তি এত প্রচুর যে, কমলাকান্তের দপ্তর ও জোবানবন্দি প্রভৃতিতে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই— বরঞ্চ বলা যাইতে পারে, সেখানে কেবল তাহার সূত্রপাত, ইচ্ছা করিলেই পরবর্তীকালের পট-ভূমিকায় তাহাকে টানিয়া আনা সম্ভব। উল্লিখিত অন্যান্য কমিক চরিত্র তাহাদের কাহিনীর ফ্রেমে আবদ্ধ— কমলাকান্ত মুক্ত ; আর-সকলের কাহিনীর কাঠামো ছাড়িয়া নড়িবার উপায় নাই, কমলাকান্ত অবাধ ; কমলাকান্তের দপ্তর বা পত্র বা জোবানবন্দি কমলাকান্ত নহে, সে-সব তাহার মন্তব্য মাত্র ; সংসারে যেমন তাহার আসক্তি নাই, ঐ-সব বস্তুতেও সে তেমনি নিরাসক্ত এবং ঐগুলির চেয়ে সে বড়ো ও স্বতন্ত্র। খুব সম্ভব এইটুকু বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে কোনো কাহিনীর ফ্রেমে আঁটিয়া দেন নাই ; সন্ন্যাসীকে সংসারে মানায় না, কমলা-কান্তকেও কাহিনীতে মানাইত না, কমলাকান্ত এতই স্বাধীন যে লেখকের

বশ্যতা অবধি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নাই।

উইট ও হিউমার -এর বাংলা কী করিব জানি না— তাই বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি। দুটাতেই হাস্যোদ্রেক করিতে পারে; উইট ও হিউমার, দুয়েরই পরিণাম হাসি— কিন্তু হাসির প্রকৃতি স্বতন্ত্র। উইটে হাসির তীক্ষ্ণতা, হিউমারে হাসির উদারতা, একটি হাসির বিদ্যুৎ, অপরটি হাসির আকাশভরা রৌদ্র, একটি অতর্কিতে মস্তকে আঘাত করে, অপরটি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম অভিভূত করিয়া মনকে অভিষিক্ত ও উদার করিয়া দেয়। উইটের আবেদন বুদ্ধিতে, হিউমারের হৃদয়ে, উইটের বিদ্যুৎ-আলোকে কেবল নিজেকে দেখি, হিউমারের দিবালোকে সমস্ত বিশ্বকে দেখিতে পাই; উইট নিছক হাসি, তাহার বিদ্যুৎ-আঘাতে দগ্ধ করিতে পারে, তুষার গলাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। হিউমারের রৌদ্রকিরণে তুষার গলে, ঝরনা চলে, চলন্ত ঝরনায় একসঙ্গে হাসির দীপ্তি এবং অশ্রুর ছলছল উঠিতে থাকে। আর উইট কেবল সংকীর্ণ নয়, তাহা একপ্রকার সামাজিক বিধান, একপ্রকার সংশোধনী অস্ত্র; হিউমার রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঋতু-পর্যায়ের মতো চরাচরের বস্তু; একটা মনুষ্যকৃত বিধান, অপরটি প্রকৃতির নিয়ম, উইটে অপরের (তন্মধ্যে দ্রষ্টা নিজেও একজন) তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা হীনতা দেখিতে পাই, হিউমারে সকলের সমান বলিয়া অনুভব করি— সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞায় উইট আত্মনেপদী আর হিউমার পরস্মৈপদী।

কমলাকান্তের হাস্যরস হিউমার-সঞ্জাত, সে হিউমারিস্ট, তাহার হাসি হিমালয়ের পাদদেশের রৌদ্রের ন্যায় প্রচুর জলকণায় ভারাক্রান্ত। হিমালয়ের পথিক সুগভীর খাদের উপরে পুঞ্জ-পুঞ্জ বাষ্পীয় শীকরে রৌদ্রকিরণের ফুল ফোটা দেখিতে পায়, আবার অবহিত হইবামাত্র সেই সুগভীর হইতে উত্থিত চাপা অশ্রুনাদও তাহার কানে প্রবেশ করে। ইহাই কমলাকান্তের হাসির স্বরূপ। হাসাইতে-হাসাইতে হঠাৎ হৃদয়ের মর্মস্থান চাপিয়া ধরিয়া এমনভাবে চোখের জল নিঙড়াইয়া বাহির করিতে বাংলা সাহিত্যের আর-কোনো নরনারীকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কমলাকান্তের হাস্যরস হাসি-অশ্রুর টানা-পোড়েনে বোনা সূক্ষ্ম ওহাড়নি। বিজয়াদশমীর প্রভাতে পিতৃগৃহ পরিত্যাগকালে উমার চোখে যখন জল, অথচ স্বদেশযাত্রার আশায় উল্লসিত নন্দী-ভৃঙ্গীর কিম্ভূত নৃত্য দর্শনে তাঁহার ওষ্ঠাধরে হাসি, সেই সময়ে স্বামীকে দেখিতে পাইয়া

সলজ্জ পার্বতী এই ওহাড়নির গুণ্ঠনখানা সসম্ভ্রমে ললাটের উপরে টানিয়া দেন।

কোনো সমালোচক বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের অনেকটা পাওয়া যায় কমলাকান্তের চরিত্রে। এ-কথা যথার্থ। কোনো-কোনো ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অনেক সৃষ্টি করিয়া অবশেষে নিজের একখানা মূর্তি বা ছবি রচনা করে, বহুসৃষ্টি-ক্লান্ত বঙ্কিমচন্দ্রেরও বোধকরি নিজের চরিত্র লিখিবার একটা ইচ্ছা জাগিয়া থাকিবে, সেই চরিত্র কমলাকান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিচিত্র উপাদানে গঠিত ছিল— তিনি কবি, মানবমনোজ্ঞ ঔপন্যাসিক, মনীষী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, হাস্যরসিক এবং দেশপ্রেমিক। কমলাকান্ত-চরিত্রে এ-সমস্তই পাই। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও কমলাকান্তকে সর্বজনপ্রিয় করিতে পারিত না। সেই উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে অহিফেনসেবী ও ভবঘুরে করিয়াছেন। সবসুদ্ধ মিলিয়া সে পাগল। কিন্তু ভোলানাথও পাগল, আবার শিশু ভোলানাথও পাগল। পাগল না হইলে কি সর্বজনপ্রিয় হয়! কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বিকল্প। সে ইচ্ছা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলা লিখিলে লিখিতে পারিত। ইহা আর-কোনো জীবিত বা কল্পিত নরনারীর দ্বারা সম্ভব— এমন কথা ভাবিতেও পারি না। বঙ্কিম যাহার বাস্তব অর্ধ, কমলাকান্ত তাহারই কাল্পনিক অপরার্ধ— এইরূপে দুইয়ে মিলিয়া একটি জীবনসত্যের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু এক জায়গায় বাস্তবের উপরে কল্পনার জিত; কাল্পনিকের সর্বজনপ্রিয়তার আভাসমাত্রও বাস্তবার্ধে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বোধকরি কমলাকান্তকে ঈর্ষা করিতেন। ঈর্ষার বিকার তাচ্ছিল্যে। এইজন্যই কি তাচ্ছিল্য করিয়া 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র একাধিক নিবন্ধ অপরকে দিয়া লিখাইয়া লইয়াছিলেন? 'চন্দ্রালোকে', 'স্ত্রীলোকের রূপ', 'মশক' অপরের রচনা। 'কাকাতুয়া' নিবন্ধটি বঙ্কিম-লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।

কমলাকান্ত-চরিত্রের মূল অনুপ্রেরণা অনাসক্তি; অনাসক্ত মন ব্যতীত বহু বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না— সে অনাসক্ত বলিয়াই একাধারে কবি মনীষী দেশপ্রেমিক ভাবুক হইতে পারিয়াছে— হাস্যরস তাহার ভাবপ্রকাশের উপায়। 'প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি

থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' —ইহাই কমলাকান্ত-চরিত্রের মূল কথা। 'ধর্ম্ম কি ? পরোপকারই ধর্ম্ম।' —ইহাই তাহার প্রকৃত স্বীকৃতি। দেশপ্রেমিক না হইলে কে 'আমার দুর্গোৎসব' বা 'পলিটিক্স' লিখিতে পারিত ? শ্লেষধর্ম সহজাত না হইলে কে লিখিতে পারিত— 'কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।' কে লিখিতে পারিত— 'সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি— সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন— স্কুল-বুক !'

সাম্যবাদ এদেশে আসিবার আগেই কমলাকান্ত সাম্যবাদী— প্রমাণ 'বিড়াল'। আর কবি না হইলে কাহার মনে আসিত— 'হায় ! কিসেই বা নয়ন ভরিবে। নয়নে যে পলক আছে !' এ-সব ছাড়া একপ্রকার বিষাদের বৈরাগ্য তাহার চরিত্রে আছে— 'সুখের কথাতেই বাঙ্গালীর অধিকার নাই।' 'আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না।' 'কমলাকান্তের বিদায়' নিবন্ধ বিষাদে বৈরাগ্যে মিশ্রিত একটি অশ্রুর বিন্দু।

বঙ্কিমচন্দ্রই কমলাকান্ত, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রেরও সাধনার বিষয় ছিল অনাসক্তি-যোগ— তবে সে-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কি না, সে-কথা স্বতন্ত্র। এ-বিষয়ে কমলাকান্ত স্রষ্টাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল— কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘায়িত ছায়ার মতোই অস্পষ্ট, কিন্তু ছায়ার মতোই সত্য। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নহে, কিন্তু সেই তো বিস্ময়, যেহেতু এমন জীর্ণ খাঁচায় এমন গগনগামী গরুড়কে আর কে ভরিতে পারিয়াছে ?

মুচিরাম গুড়

বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি নরদেহী বানরের ছবি আঁকিয়াছেন— এ-কাজ তিনি খুব ভালো পারিতেন, অনেক ক্ষেত্রেই যে তাঁহার অঙ্কিত নরের চেয়ে বানর অধিক

প্রাণবান ও সজীব, তাহার কারণ প্রাণের ইতিহাসে মানুষের চেয়ে বানরের দলিল অনেক বেশি বনিয়াদি, অনেক বেশি পাকা। রামায়ণের হনুমান মানুষ না হইয়াও অনেক গুণের বিচারে মনুষ্যত্বের আদর্শ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বানরগুলি হনুমান নয়—হনুমানের চরিত্রে মনুষ্যত্বের মশলা দেওয়া হইয়াছে—ইহারা নিছক বানর।

বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র একটি বানর। তাহার ব্যবহারে খাঁটি বানরের লজ্জা পাইবার কথা। আবার দেবী চৌধুরানীর হরবল্লভ একটি অবিস্মরণীয় বানর। ব্রজেশ্বর যখন বলিল, ডাকাতের টাকা লওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিবার বিষয় —তখন হরবল্লভ বলিয়া উঠিল—'টাকা নেব না তো কি ফাটকে যাব নাকি?' তারপর বলিল— 'আর তা ছাড়া জপতপের টাকাই বা কোথায় পাব?' এ একটি বানরোচিত উক্তি। জপতপে যে টাকা অর্জিত হয় না, সে-সংবাদ হরবল্লভ ভালো করিয়াই জানে। আবার বজরা উলটিয়া গেলে হরবল্লভ মনে ভাবিল— ডুবিয়াই গিয়াছি, আর দুর্গানাম করিয়া কী হইবে! বাস্তবিক হরবল্লভ-শ্রেণীর জীবেরা অকারণে কখনো দুর্গানাম স্মরণ করে না। এই রকম ছোটো-বড়ো অনেক বানরের সাক্ষাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে পাই। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানর মুচিরাম গুড়, সে একেবারে আদি ও অকৃত্রিম, মনুষ্যগৃহে জন্মিয়াও তাহার জাতিপরিচয় লোপ পায় নাই। আসল বানরেরা তাহার নিকট হইতে বাঁদরামির পাঠ লইতে পারে। তবে যে গুড়-মহাশয়ের জীবনচরিত বার-বার পড়িতে ইচ্ছা করে, তার কারণ বানরের প্রতি মানুষের ঔৎসুক্য প্রবল, একটা বানর আসিয়া প্রাচীরের উপর বসিলে পাড়ার লোক হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

কাল্পনিক চরিত্র আঁকিবার সময়ে সাধারণত তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়। একশ্রেণীর চরিত্র মাটি হইতে ঠেলিয়া উপরে ওঠে, যেমন উইয়ের ঢিপি; আর-একশ্রেণীর চরিত্র উপর হইতে নীচে নামে, যেমন মেঘ; আর তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র আকাশ ও পৃথিবীর করমর্দনের ফলে মূর্তি পায়, যেমন জলস্তম্ভ। প্রয়োজনভেদে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি উপায়কেই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট সত্যানন্দ, মহাপুরুষ, মাধবাচার্য, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি দ্বিতীয় উপায়ে অঙ্কিত চরিত্র, নিছক আদর্শকে 'human habitation' ও 'name' দিয়া সজীব করিবার চেষ্টা। ইহাদের অনেকাংশে অবাস্তব ও বায়বীয় বলিয়া মনে হয়— কারণ মেঘের স্বভাবে বায়বীয়তা প্রচুর, আর মাটি-পাথরের তুলনায় সে খানিক পরিমাণে অবাস্তব বইকি! নিরেট

পাঠকগণের এইসব চরিত্রের প্রতি একটা অবিশ্বাসের ভাব আছে, তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না— পুষ্করিণী নিশ্চয়ই পুষ্কর মেঘকে বায়বীয় বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। আকাশ ও পৃথিবীর— অর্থাৎ আদর্শ ও বাস্তবের— সম্মিলনে যে-সব চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, সূর্যমুখী, মোতিবিবি প্রভৃতি তাহাদের দৃষ্টান্ত—ইহাদের চরিত্রের ছাঁচটা আদর্শগত, চরিত্রসৃষ্টির উপাদান বাস্তব। ইহারা একই সময়ে অসম তাপের দুটি স্তরে বিরাজমান, ইহাদের পা মাটিতে, মাথা আকাশে। দেখিবামাত্র পাঠক ইহাদের বিশ্বাস করিয়া বসে, কিন্তু বেশি দেখিবা-মাত্র মনে সন্দেহ জাগাইয়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা কম বিশ্বাস্য বা বাস্তব নয়। তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র নিছক বস্তুগত সৃষ্টি! ইহারা শুধু মৃন্ময় নয়, ইহাদের মাথা দরজার চৌকাঠ ছাড়াইয়া ওঠে নাই বলিয়া অনায়াসে আমাদের গৃহে ও মনে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথম দৃষ্টিতেই ইহাদের চিনিয়া ফেলি এবং শেষে দৃষ্টিপাতের সময়েও ইহারা আপন থাকিয়া যায়। সাগর বৌ, হরবল্লভ, কমলমণি, দেবেন্দ্র, শ্যামাসুন্দরী, কৃষ্ণকান্ত— কত নরনারী আছে। মুচিরাম গুড় এই দলভুক্ত এবং বাঁদরামির বিচারে সকলের সেরা। প্রথমোক্ত চরিত্রগুলি অবাস্তবতার প্রলয়পয়োধিতে বিশ্বাসের ক্ষুদ্র একটি বটের পাতায় আসীন; দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রগুলি অবিশ্বাসের পদ্মপত্রে টলমল করিতেছে; আর শেষকালে কথিত চরিত্রসমূহ জন্মমুহূর্তেই শুক-সনকের মতো পূর্ণাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ঠ। নিজেকে বরঞ্চ অবিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু মুচিরামকে বিশ্বাস না করিয়া উপায় কী? তাহাকে হয়তো টাকাপয়সা দিয়া বিশ্বাস করিব না— তবু তাহার উপরে বিশ্বাস না রাখিয়া পারি কই? উইয়ের ঢিপি মন্দর পর্বতের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব।

মুচিরাম গুড় আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল— মূলে জলসেচন করিয়াছিল ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতের ব্যবস্থা। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বা ঐ-জাতীয় কোনো-একটা অপব্যবস্থার সাহায্য না পাইলে আঙুল কখনো কলাগাছে পরিণত হইতে পারে না। মুচিরামের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ইংরেজের আদালত এবং শেষের দিকে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা মুচিরামকে ফাঁপাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। বইখানা মুচিরামের ব্যক্তিগত জীবনী বটে, কিন্তু আরও বেশি তৎকালীন শাসনব্যবস্থার সমালোচনা। মুচিরাম-চরিত্রটি সজীব, এইখানে তার সাহিত্যিক মূল্য; কিন্তু যে-আবহাওয়া তাহাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে, পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মূল্যও

সামান্য নয়। এই দুয়ের সমাবেশে বইখানা একাধারে সাহিত্য ও সামাজিক দলিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারি নীতির অবাধ সমালোচনার অধিকার ছিল না— মুচিরামের জীবনীর খাতে সেই অধিকারকে তিনি বহাইয়া দিয়াছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁহাকে অনেক অপ্রিয় রায় লিখিতে হইয়াছে, মুচিরামের জীবনী অপ্রিয়তম রায়— সরকার ও সাধারণ দুয়েরই পক্ষে।

যাত্রাদলের কানমলা-খাওয়া ছোকরা মুচিরাম আদালতের মুহুরি হইল, তারপরে পেশকার, তারপরে ডেপুটি, অবশেষে রায় বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর। প্রথম দিকে তাহার সহায় অযোগ্যতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা। এ দুটির সাহায্যে যখন সে একবার মাথা তুলিয়া উঠিল, সে-মাথায় তেল দিবার লোকের অভাব হইল না। ইংরেজের রাজ্যশাসনপদ্ধতির অদ্ভুত ব্যবস্থা, ইংরেজ রাজকর্মচারীর বাংলা ভাষায় বিচিত্র অজ্ঞতা তাহাকে সবলে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছে। যে-মাধ্যাকর্ষণশক্তি সকলকে টানিয়া নামায়, তাহাই মুচিরামের উন্নতির কারণ। মুচিরামের ভাগ্য ভালো— ভাগ্য ভালো বলিয়াই এমন জীবনীকার মিলিয়াছে।

কিন্তু মুচিরাম তো একজন মাত্র নয়, সে একশ্রেণীর লোকের সুযোগ্য প্রতিনিধি। জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুচিরামের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুচিরাম আছে, পলিটিক্সে আছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে আছে, ব্যবসায়ে আছে, ধর্মজীবনে আছে— মুচিরামের অভাব কী! দিব্যদৃষ্টি থাকিলে দেখা যাইত, সংসার মুচিরামে পূর্ণ। কিন্তু এত উপাধি থাকিতে 'গুড়' উপাধিটা বঙ্কিমচন্দ্র বাছিয়া লইলেন কেন? গৌড়ের ব্যঞ্জনা মনে আনিবার উদ্দেশ্যেই কি? অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে মুচিরামের সংখ্যা যেন কিছু অধিক, তার কারণ এদেশের মাটি বড়ো উর্বরা। গত একশ বৎসরে দেশে যত মহৎ লোক জন্মিয়াছে— এত ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে নয়। আবার মুচিরাম-শ্রেণীর আদমশুমারি লইলে দেখা যাইত, তাহাদের সংখ্যাও এখানে সবচেয়ে বেশি। আগেই বলিয়াছি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অপব্যবস্থা সহায় না হইলে মুচিরাম গজায় না। বাংলাদেশে অপব্যবস্থা কিছু প্রবল, মুচিরামগণেরও তাই সংখ্যাধিক্য।

ইতিহাসের একটি নিয়ম এই যে, একই সময়ে সমাজে মহৎ ব্যক্তির এবং প্রচণ্ড দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির আধিক্য দেখা যায়। রাম ও রাবণ, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন সমসাময়িক। ইতিহাসের কোনো-কোনো যুগে অতিশয়োক্তির একটা

ঝোঁক আসে, সেই ঝোঁকের মাথায় প্রকৃতি ভালো ও মন্দ— দুইকেই প্রবল করিয়া গড়ে। কেন এমন হয়, ভাবিবার বিষয়। কোনো-কোনো রোগের ও তাহার প্রতিষেধক জীবাণু একই সময়ে রক্তে দেখিতে পাওয়া যায়— ইহাও কি সেইরকম একটা ব্যবস্থা? আসল কথা এই, একই সময়ে একই সমাজে মুচিরাম এবং তাহার জীবনীকার জন্মিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলিতে মুচিরামের জীবনচরিতের স্থান খুব সমাদৃত নয়। কেন তাই ভাবি। আকৃতিতে ক্ষুদ্র বলিয়া কি? ইহাকে উপন্যাস বলা চলে না— ইহা ছোটোগল্পও নয়। ইহা নকশাজাতীয় রচনা। অবহেলায় রচিত নকশাটির প্রতি লেখকের তাচ্ছিল্য অনুভব করিয়া পাঠকেও ইহাকে অনাদর করে। ইহাকে যদি নকশা বলিয়াই ধরা যায়, তবে বলিতে হয়, মুচিরামের জীবনচরিত নকশা-রচনার আদর্শ। শিল্পগত ত্রুটি ইহাতে নাই; আর চরিত্র-সৃষ্টির বিচারে মুচিরামের চেয়ে বেশি জীবন্ত আর কী হইতে পারে? সে ভাঁড়ু দত্ত, হীরা মালিনী ও ঠকচাচার দোসর। সমাজ হইতে মুচিরামের শ্রেণী ক্রমে দূর হইয়া যাক, কিন্তু মুচিরামটিকে আমরা কিছুতেই ছাড়িতে সম্মত হইব না। ভাঁড়ু দত্ত, ঠকচাচা প্রভৃতির সঙ্গে আসর জমাইয়া সে বাংলা সাহিত্যের একটি প্রান্ত সরগরম করিয়া রাখুক।

ভজহরি

বাগবাজারের গলিপথে চলিতে ভয় করে, মনে হয় এখনি হঠাৎ কোথা হইতে যোগেশ সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে, বলিবে, 'একটা পয়সা দিতে পার ?' মনে হয় আর-একটুখানি অগ্রসর হইলেই শুনিতে পাইব দীর্ঘশ্বাস-বাহিত 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' ধ্বনিত হইতেছে। বাগবাজার অঞ্চলের সহিত যোগেশের ব্যক্তিত্ব ও দুঃখকাহিনী এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটাকে স্মরণ করিলে আর-একটা আপনি মনে পড়িয়া যায়। কেবল 'প্রফুল্ল' নাটকখানির নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজের একটা বৃহৎ অংশেরও নায়ক বটে যোগেশ। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশেষ আকর্ষণ তাহার প্রতি নয়, প্রফুল্ল নাটকের অন্যান্য প্রধান নরনারীর প্রতিও নয়, যেমন ঐ অপ্রধান ছোকরাটির উপরে, ভজহরি যার নাম। হাসিতে, করুণায়, চোখের জলে, হিউমারে, নরকের ক্লেদে ও স্বর্গের পবিত্রতায় সৃষ্টি ঐ ছেলেটির। মিশ্রধাতুযোগে সৃষ্ট বলিয়াই ভজহরি এমন করিয়া আমাকে টানে—অনুমান করিতেছি অনেককেই টানে। এমনি মিশ্রধাতুর সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ অনুরক্তি ছিল। বাহিরে এক ভিতরে আর, বাহিরে বাঁকা ভিতরে সোজা, হাসির পক্ষীরাজে দুঃখের রাজপুত্রকে বহন-করা একশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করিতে গিরিশচন্দ্র ভালোবাসিতেন। 'পাণ্ডবগৌরবে'র কঞ্চুকী, 'সিরাজদ্দৌলা'র করিম চাচা এমনই আর-দুটি মানুষ। ভজহরি যতই অপাত্র হোক, তবু সে ঐ দলেরই লোক। গিরিশচন্দ্রের কল্পিত আর-সব নরনারী কেহ ছোটো কেহ বড়ো, কেহ ভালো কেহ মন্দ, কিন্তু এই শ্রেণীটি বিশেষভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত পছন্দের ছাপমারা। এগুলি শেক্সপিয়র-রচিত Fool-এর নিকটতম প্রতিবেশী, অর্থাৎ একজন সাধারণ লেখকের পক্ষে শেক্সপিয়রের যত কাছে যাওয়া সম্ভব, এগুলিতে তাহারই চিহ্ন।

গিরিশচন্দ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত-জীবনকে, অন্তত কলিকাতার মতো নগরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখদুঃখের কথাকে, জানিতেন। যখন সেই উপাদানযোগে সৃষ্টি করিতেন, সে-সৃষ্টি অসার্থক হইত না। ঐখানেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক নাটকগুলিতেই তাঁহার শক্তির চরম বিকাশ, কারণ পর্যবেক্ষণলব্ধ

অভিজ্ঞতার গভীরতাই সেখানে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, কল্পনাশক্তির দীনতা ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি যে ব্যর্থ, তাহার কারণ পৌরাণিক জীবন অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ করিবার নয়, সে-বস্তু কল্পনাগম্য। কল্পনাশক্তিতে তিনি দীন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁহার সহজাত। এ-বিষয়ে তিনি একক নহেন— মুকুন্দরাম ও দীনবন্ধুকেও সঙ্গে পাইবেন।

প্রফুল্ল নাটকের সবগুলি নরনারীই গভীর অভিজ্ঞতার সন্তান, কিন্তু তার মধ্যে স্রষ্টার বিশেষ একটু স্নেহ ভজহরির প্রতি—ওখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মমতা মিশিয়াছে। ঐ-রকম আর-একটি চরিত্র আমার চোখে পড়িয়াছে— 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র তিনকড়ি। কাঙ্গালীচরণ ও কেদার সমধর্মী। কিন্তু তাহারা এমনই আপাদমস্তক অসহ্য যে, তাহাদের সহনীয় করিয়া তুলিবার ইচ্ছায় ভজহরি ও তিনকড়িকে সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে— ঐটুকু সুবিচার না করিলে আমরা কাঙ্গালী ও কেদারকে সহ্য করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। ভজহরি ও তিনকড়ি কালোর উপরে শাদার টান, নরকের দেওয়ালের ফাটল, মনুষ্যত্বের অস্বীকৃতির মধ্যে অর্ধব্যক্ত স্বীকৃতি, শয়তানের মুখে সংশয়ের ছায়া। উহারা নিজেরা হয়তো সাধুসজ্জন নয়, কিন্তু অভাবিত আচরণের দ্বারা শেষপর্যন্ত সাধুত্বের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইতে বাধা দেয়। উহারা অসাধুর ছদ্মবেশে সাধু এবং সজ্জন— অসাধুতার দুর্গম দেশে সাধুতার পঞ্চমবাহিনী।

২

ভজহরি হাসির সোনার পাত্রে জীবনের ক্লেদকে বহন করিত, আধেয় ও আধারের দ্বন্দ্বে তাই তাহার জীবন এমন বিচিত্র। বাল্যকালে দারিদ্র্য ও আকস্মিকতার আঘাতে পিতৃমাতৃহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া সে কুসঙ্গে পড়িয়াছিল। কুসঙ্গের সকল দোষই সে অর্জন করিয়াছিল এবং এক-আধবার জেলখানাও ঘুরিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি টাকা খাইয়া জাল জমিদার সাজিয়া রমেশের অনুকূলে সুরেশের সম্পত্তি রেজিস্টারি করিয়া দিয়াছে। এ-হেন লোককে কোনো অভিধানের বলেই সাধুসজ্জন বলা সম্ভব নয়— কোথায় যেন তার মধ্যে, স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে স্বর্ণকণিকার মতো, এককণা সাধুতার বীজ গুপ্ত ছিল। টাকার প্রলোভনে রমেশের অনুকূলে সে জাল করিয়াছিল, এখন সুরেশের প্রকৃত অবস্থা

জানিতে পারিয়া, নিজের জেলে যাওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রকৃত তথ্য ফাঁস করিয়া দিতে সে উদ্যত! এমন লোককে সহ্য করা কঠিন হয়, যদি-না জীবনের প্রতি তার হিউমারিস্টের দৃষ্টি থাকে।

দুঃখের আঘাতে কেহ সিনিক হয়, কেহ হিউমারিস্ট হয়; ভজহরি সিনিক নয়, হিউমারিস্ট। দুঃখের আলখাল্লাটা উলটাইলেই দেখা যায় যে, সেটা বিদূষকের চাপকান। দুঃখের মর্মজ্ঞ ছাড়া কে কবে হাস্যরসিক হইয়াছে? হাস্যরস ও করুণরস অদৃষ্টের যমজ সন্তান, একটু নিরিখ করিয়া দেখিলেই দু-জনের মুখের আদল ধরা পড়িবে।

সুরেশ মৃত আত্মীয়স্বজনের মুখ স্মরণ করিয়া যখন কাঁদিতে উদ্যত, ভজহরি তখন বলিতেছে—

'মুখ মনে কত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়, এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটাগোটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তারপর শোনো, একদিন খেলে এসে বাড়িতে দেখি, সব বাড়িশুদ্ধ কাঁদছে। কি সমাচার? না জমিদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত খোলে পড়ছে, প্রাণ ধুকধুক করছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন। তারপর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা-ঠাকরুণ বেরুলেন; দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, একদিন তো গাছতলায় পড়ে মরুন—

'সুরেশ। আহা-হা

'ভজহরি। রসো— আহা-হা করো না, ঝড়ে যেমন আম পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে পড়ল আর মলো; বোনটাকে এক মাগি ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগল, আমিও কাঁদতে লাগলুম; তারপর আর সন্ধান নেই। কেমন, মুখ মনে আছে?'

ভজহরির দুঃখের এখানেই শেষ নয়, আরও আছে, কিন্তু তাহাতে আর প্রয়োজন নাই।

জীবনে দুঃখ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন সিনিকের মতো গ্রহণ না করিয়া হিউমারিস্টের মতো তাহাকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, তাহাতে জ্বালা

না কমিলেও দুঃখের ভারটা কমে। সিনিক দুঃখের প্রদীপ পিছনে ধরিয়া পথ চলে, তার অন্ধকার আর ঘোচে না; হিউমারিস্টের প্রদীপ সম্মুখে— তাহাতে পথের বাধা দূর না হইলেও বাধা এড়াইয়া চলা অসম্ভব হয় না। ভজহরির জীবনপথ দুর্গম, হয়তো শেষ পর্যন্ত জেলের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে— তবু সান্ত্বনা এই যে, পদে-পদে তাহাকে হোঁচট খাইতে হয় না, হাতে তাহার জ্বালাময়ী হাসির দীপ্তি।

ভবতারণ পিশাচখণ্ডী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস একাধারে কাহিনী এবং হাজার বছরের পুরানো বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস। প্রাচীনকালের বাঙালির কথাই এই কাহিনীটির উপজীব্য। কিন্তু কেবল বাংলাদেশের চিত্রই ইহাতে আছে মনে করা ঠিক হইবে না। কাহিনীর স্রোত তৎকালীন বাঙালির জীবনকে উপচাইয়া ভারতবর্ষের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছে। পাঠক কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে শুরু করিলে বঙ্গাধিপতির দূত ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ কনৌজ শহর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবেন। কাহিনীর এই অংশ আবার একাধারে ভূগোল ও ইতিহাস। কালিদাস একবার বর্ষার মেঘের সংক্রমণপথ বর্ণনা উপলক্ষে সমকালীন ভারতভূখণ্ডকে জরিপ করিবার সুযোগ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাহিনীর সূত্রটাকে বাংলাদেশের জীবনযাত্রার বাহিরে টানিয়া লইয়া তৎকালীন বৃহত্তর জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীর দাবি যেমনই হোক-না কেন, ভারতবর্ষকে ভালো না বাসিলে তাঁহারা এমন করিতেন না। দেশপ্রীতি গভীরতর অর্থে মজ্জাগত না হইলে দেশের কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

বঙ্গাধিপতির রাজদূতটির নাম ভবতারণ পিশাচখণ্ডী। পিশাচখণ্ড গ্রামে তাঁহার বাড়ি, তাই পিশাচখণ্ডী। কাহিনীর পূর্বার্ধে তিনি 'মস্করী' নামে পরিচিত। মস্করী কী? না, তিনি বাড়িতে-বাড়িতে আমোদপ্রমোদ, নাচগান ও ছবি দেখাইয়া ফিরিতেন— ইহা তাঁহার জাতব্যাবসা নহে, নিতান্তই ব্যক্তিগত গুণ।

বিহারী দত্ত সাতগাঁয়ের বেনে-সমাজের শ্রেষ্ঠ। মায়া তাহার একমাত্র সন্তান। সে শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের পত্নী। সম্প্রতি সে বিধবা হইয়াছে। সে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল— দুই কুলেরই বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে বৌদ্ধ মঠে লইয়া ভিক্ষুনী করিতে পারিলে বৌদ্ধ মঠ তাহার বিপুল সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে, এই আশাতে বৌদ্ধরা মেয়েটিকে হরণ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশের রাজা বৌদ্ধ, কাজেই বেনেরা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারে না। এক সময়ে মায়াকে হরণের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল— তখন মস্করী কৌশল করিয়া লুকাইয়া

রাখিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তারপরে হিন্দু ও বৌদ্ধে লড়াই বাধিয়া গেল। বৌদ্ধরা পরাজিত হইল, সাতগাঁর বৌদ্ধ নৃপতি রূপা রাজা নিহত হইল, বাংলাদেশে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন মস্করী মায়াকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার উপরে সকলেই খুশি— রাজা এবং বেনে-সম্প্রদায়। যুদ্ধে যাহারা হিন্দুদের সাহায্য করিয়াছিল তাহারা যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি দাবি পিশাচখণ্ডীর, কারণ তিনি বেনের মেয়েকে রক্ষা না করিলে এত যুদ্ধ-বিবাদ সবই ব্যর্থ হইত। সব কাজ শেষ হইয়া গেলে মহারাজাধিরাজ মস্করীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী চাও? মস্করী বলিলেন, মহারাজ, নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। তিনি বলিলেন, মহারাজ, আমার আবেদন এই যে, প্রাচীনকালে বিক্রমাদিত্য, হর্ষ প্রভৃতি চক্রবর্তী রাজগণ যেমন সভা করিয়া ভারতখণ্ডের সকল গুণীজ্ঞানীকে আহ্বান করিতেন, তাঁহাদের গুণপনা বিচার করিয়া যথোচিত পুরস্কার করিতেন, আপনি তেমনি করুন। পিশাচখণ্ডী বলিলেন, ইহাই আমার আবেদন। রাজা বলিলেন, সে তো একদিনের কাজ নয়। আয়োজনের জন্য অন্তত এক বৎসর সময় লাগিবে। রাজ-আদেশে স্থির হইল যে, আগামী বৎসরের ফাল্গুনী পূর্ণিমাব দিনে সাতগাঁয়ে সেই সভা বসিবে। রাজ-আদেশে আরও স্থির হইল যে, পিশাচখণ্ডী স্বয়ং রাজদূতরূপে ভারতবর্ষের গুণীসমাজকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইবেন। নিমন্ত্রণে হিন্দু বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থ আচারী অনাচারী কোনো প্রভেদই থাকিবে না। পিশাচখণ্ডী যাইবেন, তাঁহার সহিত যথাপ্রয়োজন লোক-লস্কর থাকিবে। পিশাচখণ্ডী এখন রাজদূত, তাঁহার চিন্তা কী?

২

সাতগাঁয়ের কাজকর্ম শেষ করিয়া পিশাচখণ্ডী নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। পুস্তকের ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ভারতভ্রমণের বিবরণ। প্রথমে বিহার, পরে বর্তমান যুক্তপ্রদেশ, কাশী, কনৌজ, মায় বৃন্দাবন-মথুরা। তৎকালীন বিহার বৌদ্ধ-গৌরবের ধ্বংসাবশেষ; কাশী, কনৌজ হিন্দুযুগের গৌরবে উজ্জ্বল। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস বাংলায় বৌদ্ধযুগের অবসান এবং হিন্দুযুগের পুনরুত্থানের কাহিনী। পিশাচখণ্ডীর নিমন্ত্রণের পরিক্রমাসূচিতেও কৌশলে যেন তাহারই আভাস। কাহিনী যেমন বৌদ্ধযুগ অতিক্রম করিয়া হিন্দুযুগে প্রবেশ করিয়াছে, পিশাচখণ্ডী-

মহাশয়ও তেমনি বৌদ্ধ বিহার লঙ্ঘন করিয়া কনৌজের হিন্দুরাজ্যে পৌছিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদ-দুটিতে প্রাচীন ভারতের যে-রসোজ্জ্বল চিত্র আছে, ভারতসন্ধানী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা পাঠ্য। সামান্য প্রবন্ধে তাহার কতটুকু পরিচয় আর দিতে পারিব।

পিশাচখণ্ডী প্রথমে মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পৌছিলেন। সেখানকার কাজ সারিয়া তাঁহার নৌকা গঙ্গা বাহিয়া আবার পশ্চিম-মুখে চলিল। এখন যেখানে বক্তিয়ারপুর, সেখানে তিনি নামিলেন। নৌকার মাঝিদিগকে পাটনায় গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। লেখক বর্ণনা করিতেছেন— 'এখানটাই মগধের প্রধান জায়গা, বড় বড় মাঠ, বড় বড় গ্রাম, বড় বড় গো-চর, প্রচুর ফসল হয়, প্রচুর দই-দুধ পাওয়া যায়, প্রচুর চিড়া, প্রচুর মুড়কি, প্রচুর মিষ্টান্ন, প্রচুর খোয়া ক্ষীর, প্রচুর খাজা।' মস্করী সন্ধ্যার পরে কোনো গোয়ালে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া খান, সঙ্গীরা বাজারের মিষ্টান্ন খাইয়া ফলাহার করিয়া রাত কাটায়। মগধের যে-দৃশ্য মস্করী দেখিয়াছিলেন, আজও সেই দৃশ্য পথিকের চোখে পড়িবে। শ্রমণ গৌতম যখন মগধে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনিও এই দৃশ্য দেখিয়াছেন। আবার তারও অনেক আগে ভীমার্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ যখন জরাসন্ধের রাজধানীতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই এই একই দৃশ্য দেখিয়া থাকিবেন। মানুষ বদলায়, প্রকৃতি বড়ো একগুঁয়ে।

একদিন তাঁহারা দূর হইতে মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীর অত্যুচ্চ ফটক দেখিতে পাইলেন। ওদন্তপুরীর রাজসভা বঙ্গাধিপতির দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইল, বঙ্গাধিপতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। মগধেশ্বর সখেদে জানাইলেন যে, এক সময়ে মগধে গুণীজনের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহার সে-গৌরবের দিন আর নাই। তিনি বলিলেন— 'শ্রীশ্রী৺শ্রীনগর পাটলিপুত্র এখন প্রায় গঙ্গার গর্ভে। আমরা একরূপ মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছি বলিলেই হয়।'

তারপরে মস্করী ওদন্তপুরীর বিহারে গিয়া দেখিলেন যে, দুই তলায় দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর থাকিবার স্থান। আর দেখিলেন বিহারের অমেয় ঐশ্বর্য। এই সময়ের প্রায় দুই শত বৎসর পরে মহম্মদিয়া বক্তিয়ার এই বিহার লুঠ করিয়া সত্তরটি অশ্বতরযোগে সোনা-রুপা-হিরার স্তূপ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ওদন্তপুরী হইতে পিশাচখণ্ডী নালন্দায় আসিয়া পৌছিলেন। 'নালন্দায় একটি বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার একধারে বড় বড় বিহার, একটার পরে একটা, তারপরে একটা, দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আর একধারে কেবল স্তূপ, বড়টা ২০০/২৫০ ফুট উঁচা, আর মাঝারি ছোট যে কত আছে, তার ঠিকানা নাই।...রাস্তার ধারে যে সকল বিহার ছিল, তাহার ঠিক মাঝখানে বালাদিত্যবিহার, চারতলা উঁচা। এখনকার লাটসাহেবের বাড়িতে যেমন বাহির দিয়া প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি দুতলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহারও ঐরূপ এক সিঁড়ি একেবারে রাস্তা হইতে দুতলা পর্য্যন্ত গিয়াছে।...সিঁড়ির সামনে দুতলায় যেখানে খোলা চাতাল আছে, তাহার উপরে তেতলা ও চৌতলায় অধ্যক্ষের থাকিবার স্থান।'

নালন্দা হইতে পিশাচখণ্ডী রাজগৃহে পৌছিলেন। চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে সমতল জমি—ইহাই ছিল জরাসন্ধের রাজধানী। নালন্দা হইতে যে 'সেথো' সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাঁহাকে বুদ্ধদেবের প্রিয়ভূমি গৃধ্রকূট দেখাইল, নূতন রাজ-গৃহ শহর দেখাইল, 'গিরি-এক' নামে হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড় দেখাইল। গৃধ্রকূটে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং গিরি-একে জৈন সন্ন্যাসী দেখিলেন, সকলেই ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

এখান হইতে গয়া, গয়া হইতে বোধগয়া। বোধগয়ার মন্দির, শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ছেদিত অশ্বত্থ গাছ, গাছটা চারশ বছরে আবার প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়া মন্দিরটাকে শিকড়ের প্রয়াসে কাটাইয়া দিয়াছে— মস্করী সবই দেখিলেন। তিনি নারদের নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছেন। যেখানে গুণী লোক দেখেন, তাঁহাকেই বঙ্গাধিপতির নিমন্ত্রণ জানান। বোধগয়ায় মস্করী 'দুই তিনজন নেপালী, দুই তিন-জন ভুটিয়া ও দুই তিনজন সিংহলীকে সভায় যাইবার জন্য জেদ করিয়া গেলেন... সেখানে আরও দেশ-বিদেশের পণ্ডিত পাওয়া গেল। দুইজন পারসীক বৌদ্ধেরও নিমন্ত্রণ হইল। নীলা নদীর উত্তরে দুইজন রোম দেশের লোকেরও নিমন্ত্রণ হইল।'

তারপরে পাটনা। পাটলিপুত্র এখন প্রায় জনশূন্য। জল, আগুন আর ঝগড়ায় পাটলিপুত্র কতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার আর-এক প্রবল শত্রু ছিল ভূমিকম্প। সাড়ে-তিনশত বৎসর আগে এক মহা ভূমিকম্পে সমস্ত নগর বসিয়া যায়। এখনো সেই 'শ্রীহীন অবস্থা'। মগধের লোকেরা পাটলি-

পুত্রকে বলিত 'নগর'। ইদানীং ভাঙা নগরকে শ্রীনগর বলিত। পিশাচখণ্ডী ঘুরিয়া পাটলিপুত্রের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলেন।

ক্রমে মস্করী কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। 'কাশী এ সময়ে ছোট ছোট তুটি নগর। একটি মৃগদাব আর একটি অবিমুক্তক্ষেত্র। তু জায়গায়ই লোকজন অনেক, এক জায়গায় হিন্দু আর এক জায়গায় বৌদ্ধ।' হিন্দু কাশী জ্ঞানবাপী জলাশয়ের চারদিকে, মাঝখানে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির। বৌদ্ধ কাশী বা মৃগদাব একদিকে তুইটি স্তূপ। তুটিই প্রকাণ্ড। একটির এখন চিহ্নমাত্র নাই। সে-সময়ে ইহা ১৬০ ফুট উচ্চ ছিল। মৃগদাব ও অবিমুক্তক্ষেত্রের মাঝখানে রাজবাড়ি। রাজা কান্যকুব্জরাজের সামন্ত। মস্করী উভয় স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে বঙ্গেশ্বরের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। বেদান্তী চিৎসুখাচার্য এবং উদয়নাচার্য বাংলাদেশে যাইতে স্বীকার করিলেন।

কাশীর কাজ শেষ হইলে মস্করীর নৌকা কনৌজ যাত্রা করিল। মাঝপথে ত্রিবেণীতে তিনি তীর্থস্থান সারিয়া লইলেন। অবশেষে তাঁহার নৌকা কনৌজের ঘাটে লাগিল। এত বড়ো শহর মস্করী ইতিপূর্বে দেখেন নাই। শহরটি তিন ক্রোশ দীর্ঘ, গঙ্গার ধারে, প্রস্থেও প্রায় তিন ক্রোশ। কনৌজ একধারে রাজধানী, বন্দর, ব্যবসায়ের স্থান, বিদ্যার স্থান এবং সেনানিবাস।

কনৌজে উপস্থিত হইয়া মস্করী সকলের মুখেই এক কথা শুনিতে পাইলেন যে, মুসলমান আসিতেছে। তিনি দেখিলেন সকলেই যুদ্ধসজ্জায় ব্যস্ত। তিনি শুনিলেন যে, রানী একজোড়া বালা মাত্র রাখিয়া সমস্ত অলংকার দিয়াছেন, রাজা এক বছরের রাজস্ব দিয়াছেন ব্যবসায়ীরা ছয় মাসের মুনাফা দিয়াছে—যুদ্ধের খরচ বাবদ। রাশি-রাশি উপকরণ ছালাবন্দী হইতে তিনি দেখিলেন। মাঝখানে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব ধ্বংস হইলেই মুসলমান কনৌজে আসিয়া পড়িবে, এমন সোনার কনৌজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এমন অবস্থায় মস্করীর রাজসভার আমন্ত্রণে কেহ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। তিনি মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন। ভাবিলেন, রাজসভায় অধিবেশন শেষ হইলেই বাংলাদেশকেও মাতাইতে হইবে, নিজেও যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। ইহাই ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর ভারতভ্রমণ।

৩

কালিদাসের যক্ষ বার্তাপ্রেরণের ভার মেঘের উপরে না দিয়া পিশাচখণ্ডীর হাতে অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারিত। পিশাচখণ্ডী অলকায় গিয়া যক্ষপত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বামীর বার্তা পৌছাইয়া দিত— সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে অনেকগুলি নরনারী আছে— পাঠক যাহাদের ভালোবাসিতে বাধ্য হইবে— তাহাদের মধ্যে পিশাচখণ্ডগ্রাম-নিবাসী ভবতারণ শর্মা সকলের শ্রেষ্ঠ। এমন নির্লোভ, পরার্থপর, স্বদেশবৎসল ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে বিরল, কেবল 'মৃণালিনী' উপন্যাসের হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্যের সহিত ইঁহার তুলনা হয়। কিন্তু এক হিসাবে মাধবাচার্যের উপরে মস্করীর জিত। মাধবাচার্য বড়ো বেশি গুরু, একেবারে গুরুতর ; মস্করী সামাজিক লোক, দশজনের একজন। প্রয়োজন হইলে নাচগানের দ্বারা লোকের চিত্তবিনোদন করিয়া তিনি স্বকার্য উদ্ধার করিতে পারেন— অথচ অন্তরটি আশ্বিনের আকাশের মতো নির্মল এবং স্বদূরপরাহত। বিহারী দত্তর মেয়ের রক্ষাকর্তা হিসাবে ইচ্ছা করিলেই তিনি প্রচুর পারিতোষিক পাইতে পারিতেন। সেদিকে তাঁহার মন গেল না। বঙ্গেশ্বরের প্রভাব বিস্তার হইবে এই আশায় তিনি রাজসভার অধিবেশনের দাবি করিয়া বসিলেন এবং নিমন্ত্রণের ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। ঘরের খাইয়া যাঁহারা বনের মহিষ তাড়ায়, পিশাচখণ্ডী সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোক।

দেবযানী

রবীন্দ্রনাথ 'বিদায়-অভিশাপ' -এর মূল কাহিনীটি মহাভারতের কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল কাহিনীর রূপান্তরকালে একাধিক গৌণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কচের ব্যবহারে পুরুষোচিত মর্যাদা ও সম্ভ্রম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দেবযানীর চরিত্রে কোনো পরিবর্তন কবি করিতে পারেন নাই, করিবার প্রয়োজনও ছিল না; দেবযানীর উদ্দেশে যেন তিনি বলিয়াছেন, 'যেমন আছো তেমনি এসো'। মহাভারতের কাহিনীটি কতকাল আগে কল্পিত হইয়াছিল জানি না, ধরা যাক, পাঁচ হাজার বৎসর, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেবযানীর কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। সে আজও যেমন আধুনিকা, সেদিনও তেমনি আধুনিকা ছিল, সে প্রাচীনতম আধুনিকা। দেবযানী সবচেয়ে পুরাতন 'মডার্ন উয়োম্যান'।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি যে-সব নারীকে আমাদের দেশে আদর্শ বলা হয়, দেবযানী কোনোক্রমেই তাঁহাদের দলভুক্ত নয়। তাহাকে আদর্শ পত্নী, আদর্শ প্রণয়িনী বা আদর্শ মাতা বলিবার উপায় নাই, সে আদর্শহীনতার আদর্শ। দুর্দম প্রণয়পিপাসা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কোনো বাধাই সে মানিতে প্রস্তুত নয়, বেচারি কচ কোনোরকমে পালাইয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে-সুযোগ ঘটে নাই। শর্মিষ্ঠার কৌশলে সে একটি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অনুকম্পাবশত যযাতি তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল; অমনি দেবযানী বলিয়া বসিল— এবারে আমাকে বিবাহ করো, আমার পাণিগ্রহণ তো করিয়াছ। হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিলে যে পাণিগ্রহণ করা হয়— বেচারি যযাতির তাহা জানা ছিল না, এমন হইলে কে আর পরোপকারে প্রবৃত্ত হইবে! এরূপ ব্যবহার নিশ্চয় নারীত্বের আদর্শ নয়। কিন্তু নাই বা হইল আদর্শ। প্রাচীন ভারতের নারীসমাজের মধ্যে সে সম্পূর্ণ একক! কোনো পুরুষের তাহাকে ভালো না লাগিলে বুঝিতে হইবে সে সম্পূর্ণ পুরুষ নয়। পৌরুষের পরীক্ষার স্থল দেবযানীর চরিত্র। তাই বলিয়া তাহাকে বিবাহ! না, সেরূপ বলিতেছি না। ভালো-লাগা ও ভালোবাসা এক পদার্থ নয়।

কচ দেবযানীকে ভালোবাসিত, কিন্তু তাহার তো স্বাধীনতা ছিল না, সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তাহাকে স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে, দেবযানীকে লইয়া ঘর পাতিয়া বসিলে তাহার চলিবে না। শুক্রাচার্যের তপোবন হইতে কচের বিদায়-মুহূর্ত সমাগত, দেবযানীর নিকটে সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। দেবযানী এই ক্ষণটির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে একেবারে ক্ষুধার্ত বাঘিনির মতো হতভাগ্য কচের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল। প্রথমেই লাফটা দেয় নাই, কিছুক্ষণ শিকারের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, কিছুক্ষণ শিকারের চারিদিকে চক্রাকারে আবর্তন করিয়াছিল, কিছুক্ষণ সে অগ্রিম শিকারসুখ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু কচ পালাইবার উদ্দেশ্যে পা তুলিবামাত্র বাঘিনি তাহার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল— তাহার অন্তস্তম তল হইতে আর্ত হুংকার নিঃসৃত হইল—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

নিঃসৃত হইল—

আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
'বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ,' নাহি ক্ষতি,
নাহি কোনো লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা, সাধনার ধন।

দেবযানীর এই স্পর্ধিত আহ্বান, এই উদ্ধত অভিনয়, নারীমহিমায় এই অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গ— অকস্মাৎ উর্ধ্বোত্থিত হইয়া স্বর্গলোককে কি ঈর্ষাময় বেদনার শূলে বিদ্ধ করে নাই? এই মুহূর্তে দেবযানীর যে-বিরাট স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার দিকে তাকাইবার উপায় কী? কঠিন তুষারপুঞ্জে প্রতিফলিত রবিরশ্মির মতো চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। সত্যই ইন্দ্র আর ইন্দ্র নহে, দেবযানী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার সিংহাসনখানি দখল করিয়া বসিয়াছে।

কচ তাহাকে কতরকমেই-না ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কর্তব্যের আহ্বান, ধর্মের ব্রত, পুরুষের আদর্শ। কিন্তু না, দেবযানী ভুলিবার নয়। অবশেষে কচকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সে দেবযানীকে ভালোবাসে— তাই বলিয়া বিবাহ! না, তা হইবার নহে। কিন্তু 'প্লেটোনিক' প্রেমে ভুলিবার পাত্রী দেবযানী নহে। সে যে নিতান্ত মৃন্ময়ী— মাটির সমস্ত দোষ এবং সমস্ত গুণে তাহার দেহ নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে। সে জানে সংসারে যেটুকু হাতে-হাতে পাওয়া গেল সেইটুকুই যথার্থ পাওয়া। তাহাব অধিক যাহা সে তো কেবল কল্পনা, সে তো কেবল অনুমান। মৃত্যুর নির্ঝরের ধারে যাহার বাস, দেহের প্রমাণ ব্যতীত তাহার সান্ত্বনা কোথায়? বিধাতা তাহাকে গড়িবার সময়ে মাটি ছাড়া আর-কোনো উপাদান ব্যবহার করেন নাই। যখন সে দেখিল কচ নিতান্তই বিদায় হইবে, তাহার মোহে কিছুতেই ধরা দিবে না, তখন আহত নারীচিত্তের সমস্ত আক্রোশ ও ঈর্ষা, সমস্ত অবলুণ্ঠিত মহিমা ও ব্যর্থ প্রণয় বজ্রাগ্নি-পরিপূর্ণ একখানি মারাত্মক বিদ্যুতের প্রচণ্ডতায় তাহার মাথাব উপরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—

তোমা-'পরে
এই মোব অভিশাপ— যে বিদ্যার তরে
মোরে কব অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

এই চরিত্র ও ব্যবহার নিশ্চয়ই আদর্শ নয়— কিন্তু তবু যে এত ভালো লাগে, তার কারণ মানুষ আদর্শকে ভক্তি করে, আর ভালোবাসিবার বেলায় অনেক সময়েই অনাদর্শকে বাছিয়া লয়। মর্ত্যবাসী আমরা দেবযানীর দুঃখেব ভাগী, তাহাকে কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু দূর হইতেই বোঝা ভালো, নতুবা কূপ হইতে হাত ধরিয়া তুলিলে পাণিগ্রহণ কবিবার জন্য যে-মেয়ে জেদ করিয়া বসে তাহাকে দূর হইতে ভালোবাসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেবযানীর অনুরূপ প্রাচীন সাহিত্যে বিরল বলিয়াছি— রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার একটি জুড়ি আছে। সে 'বাঁশরি' নাটিকার নায়িকা—'শ্রীমতী বাঁশরি সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার

প্রকৃতিটা বৈদ্যুত শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শানদেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য।' বাঁশরি সরকারের আকৃতি ও প্রকৃতি দেবযানীর উপরে আরোপ করা অন্যায় হইবে না— দু-জনেরই ধমনীতে একই রক্তপ্রবাহ বহমান। অবস্থা-ভেদে বাঁশরি দেবযানী হইয়া উঠিতে পারিত, কালভেদে দেবযানী বাঁশরিতে পরিণত হইয়াছে। 'বাঁশরি' নাটিকা 'বিদায়-অভিশাপে'র উপাদানে রচিত— কেবল কালের একটা দুস্তর ভেদের ফলে নাটিকাটি বিদায়-অভিশাপের পরিবর্তে 'বিদায়ে বরদান' হইয়া উঠিয়াছে।

বাঁশরি ভালোবাসিত তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজা সোমশংকরকে। বিবাহের বাধা ছিল না, কিন্তু বাধা হইয়া দেখা দিলেন সোমশংকরের গুরু। সোমশংকর কঠিন ব্রতচর্যায় উদ্যত। গুরুর ভয় বাঁশরিকে বিবাহ করিলে ব্রতের উপরে বাঁশরির জয়লাভ ঘটিবে, তাই তিনি সুষমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সোমশংকরের বিবাহ স্থির করিলেন। অভিমানিনী তেজস্বিনী বাঁশরি সোমশংকরকে আঘাতদানের উদ্দেশ্যে ক্ষিতীশ ভৌমিক নামে একজন অভাজন সাহিত্যিককে বিবাহ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। এমন সময়ে নিজের বিবাহের পূর্বমুহূর্তে সোমশংকর বাঁশরির কাছে বিদায় লইবার জন্য আসিয়াছে—

সোমশংকর

'তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জানো।

বাঁশরি

'তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন ?

সোমশংকর

'সে কথা বুঝতে যদি নাও পারো, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরি

'তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশংকর

'কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো এক সংকটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরি

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না ?

সোমশংকর

'নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে।...

বাঁশরি

'সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা।

কচ ও দেবযানীর সংলাপের স্বরটা আলাদা, বিষয়টা বাঁশরি-সোমশংকরের সংলাপের অনুরূপ। সোমশংকরের ভালোবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া বাঁশরি প্রসন্নমনে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দেবযানী তাহা পারে নাই। তৎসত্ত্বেও দু-জনেই একই ধাতুতে গঠিত। বাঁশরি বিলাতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে —আর শুক্রাচার্যের কন্যার চরিত্রেও পাশ্চাত্যদেশের উপাদান আছে। বাঁশরি যখন জানিল বিবাহ যাহাকেই করুক সোমশংকর তাহাকেই ভালোবাসে, তখন তাহাকে আঘাত করিবার প্রয়োজন আর রহিল না, ক্ষিতীশ ভৌমিকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব সে নাকচ করিয়া দিল। ইহাই 'বাঁশরি' নাটিকার কাহিনী।

দেবযানী ও বাঁশরি অনুরূপমাত্র, একরূপ নয়, তার কারণ বাঁশরি আমাদের আর-সকলের মতোই নীতির জগতের অধিবাসী : এটা ভালো, ওটা মন্দ—এই দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে তাহার প্রচণ্ডতাকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছে, দেবযানীতে যে-ঝাঁজ পাই, বাঁশরিতে তা পাই না। আর দেবযানী সেই আদিম জগতের ব্যক্তি, যেখানে সুনীতিও নাই, দুর্নীতিও নাই— সে এক অনীতির জগৎ, যাহার স্মৃতিটুকুও মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল মাঝে-মাঝে বিদায়-অভিশাপের মর্মন্তুদ আর্ত হাহাকারে চকিতের মধ্যে সেই ভোলা দিনের আভাস মনে প্রবেশ করিয়া মানুষকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। মনে পড়িয়া যায়, আমরা সকলেই সৃষ্টির কোন্‌-এক ব্রাহ্মমুহূর্তে এমনই অনীতির জগতে বিচরণ করিতাম। দেবযানীর মধ্যে আমাদের সেই হারানো সত্তাকে দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি

দেবযানী আমাদের প্রাক্-পৌরাণিক রূপ। যে-কারণে প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই, দেবযানীর প্রতিও ঠিক সেই আকর্ষণ। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তো প্রাগৈতিহাসিক হইতে চাই না, দেবযানীর শিকারেও পরিণত হইতে চাই না। দূরত্বেই ইহার আসল রস—দূর হইতেই দেবযানী রমণীয়।

মালিনী

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকখানি আশানুরূপ লোকপ্রিয় নয়। চারটি মাত্র দৃশ্যে বর্ণিত, সংহত, সংযত, সর্বপ্রকার বিষয়বাহুল্যহীন কাব্যনাট্যখানিতে (পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৯) স্ফটিক শিলাখণ্ডের দীপ্তি, কাঠিন্য এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শীতলতা লক্ষিত হয়। এমন বস্তু লোকপ্রিয় না হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ পাঠক পরিসরের ব্যাপ্তি চায়, বহু বিষয়ের শিথিলতা চায় এবং মাঝে-মাঝে জিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে নমনীয় উপত্যকার আশ্রয় চায়। মালিনী নাটকে এ-সব কিছুই নাই। ফলে মালিনীর পাঠকসংখ্যা স্বল্প।

কিন্তু এই কাব্যখানি কবিত্বগুণে এবং চরিত্র-পরিকল্পনায় এক অভিনব বস্তু। রাজকুমারী মালিনীর চরিত্রটিকেই লওয়া যাক।

ওস্তাদ খেলোয়াড় যেমন তীক্ষ্ণ তলোয়ারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, না কাটে তাহার পা, না যায় সে পড়িয়া, অথচ দুয়েরই আশঙ্কা অবিরল, তেমনি মালিনী-চরিত্র-বরাবর নাটিকার কাহিনী প্রবাহিত, কোথাও এতটুকু স্খলন নাই, কোথাও এতটুকু পতন নাই। যেখানে আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, সেখানেই কবিত্বের পরা কাষ্ঠা। মালিনীর অনুরূপ চরিত্র কবি দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করেন নাই ; কোনো-কোনো ক্রীড়াকৌশল আছে যাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নহে।

মালিনী নাটকের প্রথম তিন দৃশ্যে মালিনীর এক মূর্তি পাই, চতুর্থ দৃশ্যের মালিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর অবনমন ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে যাহাকে দেখি তুষারনদী, যাহার জ্যোতিদীপ্তিতে চোখ ঝলসিয়া যায়, চতুর্থ দৃশ্যে সে হইয়াছে ঝরনা, কেবল তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ নয়, সে যেন

আমাদের গ্রামেরই অঙ্গীভূত। তুষারনদীকে কবে কে আপন মনে করিতে পারিয়াছে? প্রথম দিকে মালিনী ছিল দেবী, শেষের দিকে সে হইয়াছে মানবী। মালিনী-চরিত্রের বিবর্তনে ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার।

প্রথম দিকের মালিনীর হৃদয়ে নবধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে। এই আবির্ভাব শব্দটির উপরে বিশেষ জোর দিতে চাই। মালিনী কাশীরাজের কন্যা; সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে কাশীরাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ রাজার কাছে মালিনীর নির্বাসনদণ্ড প্রার্থনা করিয়াছে। হঠাৎ বিদ্রোহী জনসমুদ্রের দিগন্তে অবরোধমুক্ত রাজকন্যার আবির্ভাব জনতাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে। যে-মূঢ়ের দল তাহার নির্বাসন চাহিয়াছিল, তাহারাই মুগ্ধ হইয়া মালিনীকে লোকমাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমনই মালিনীর লোক-পরিচালন-ক্ষমতা।

বিদ্রোহীদের নেতা দুই বন্ধু ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়। তাহারা মূঢ় নয়, মুগ্ধও হয় নাই। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে দেশে রাখিয়া বিদেশে যাত্রা করিল, পররাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কাশীরাজের কলঙ্ক দূর করিবে এই আশাতে। ক্ষেমংকরহীন সুপ্রিয় ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করিয়া বসিল! ক্ষেমংকরের অনুপস্থিতিতে সে মুগ্ধতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজকন্যার সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিল, পরিচয় অচিরকালের মধ্যে প্রণয়ে পরিণত হইল— প্রণয়টা একতরফা নয়। কর্তব্যবোধে, প্রণয়ের অনুরোধে সুপ্রিয়র কত বিচিত্র কাজকেই না কর্তব্য বলিয়া মনে হয়; রাজার কাছে সে ক্ষেমংকরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিল। রাজা অনায়াসে আসন্নপ্রায় ক্ষেমংকরের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দীভাবে লইয়া আসিলেন। সুপ্রিয় রাজ্য রক্ষা করিয়া দিল— কাজেই তাহার কিছু পুরস্কার প্রাপ্য। কোন্ পুরস্কার সে চায়? সে কি রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক? সুপ্রিয় ইতস্তত করিয়া বন্ধুর মুক্তি প্রার্থনা করিল। কিন্তু সুপ্রিয় ও মালিনীর বিবাহ যে রাজার অনভিপ্রেত নয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মালিনীর তাহাতে আপত্তি নাই— মিত্রঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, নবধর্মের ভূতপূর্ব শত্রু, সুপ্রিয়কে বিবাহের প্রস্তাবে মালিনী দ্বিধামাত্র করিল না— একবার মৌখিক লজ্জাও প্রকাশ করিল না। যে-কাজ করিতে একজন সাধারণ মানবকন্যা অন্তত করি-কি-না-করি ভাবিত, মালিনী অনায়াসে তাহা স্বীকার করিয়া লইল। এই কি নাটকের পুরোভাগের

দেবী মালিনী? চতুর্থ দৃশ্যে সাধারণ মানবীর স্তরেরও নীচে যেন সে নামিয়া গিয়াছে! এমন কী করিয়া হইল?

এবারে 'আবির্ভাব' শব্দটির উপর জোর দিবার কথা স্মরণ করিতে বলি। মালিনীর জীবনে নবধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে, সাধনার দ্বারা তাহাকে লাভ করিতে হয় নাই। যতদিন আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল, মালিনী দেবী ছিল; সেই দীপ্তি ম্লান হইবার সঙ্গেই সে মানবী হইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বল বাতিটা নিবিয়া গেলে ঘর একটু বেশি অন্ধকার মনে হয়, বাতি যত বেশি উজ্জ্বল, নিবিবার পর ঘর তত বেশি অন্ধকার। প্রান্তভাগের মানবী পুরোভাগের দেবীর তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। ইহাই স্বাভাবিক—এমন না হইলেই অদ্ভুত হইত এবং কবিকল্পনা স্বকর্তব্যচ্যুত হইত।

নবধর্ম যাহারই হৃদয়ে দেখা দেয়, আবির্ভূত হইয়াই দেখা দেয়। সেটা ইচ্ছাধীন নয়। সেই আবির্ভাবকে অর্থাৎ পড়িয়া-পাওয়াকে সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা আপন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু জীবনে লালন করিয়া তুলিবার আগে তাহাকে জীবনে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে সব সময়ে আবির্ভাব সুফল দেয় না—অন্তত দীর্ঘ-কাল নিশ্চয় দেয় না। জীবনের জটিল ক্ষেত্রে আবির্ভাবটাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য সাধনারও আবশ্যক। বাল্মীকির কবিকল্পনার শিখরেও একদিন এমনি একটি আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, আদি শ্লোকটি আদিকবির আবির্ভাবলব্ধ। কিন্তু রামায়ণ কাব্য তো আবির্ভাব নয়, সে যে সাধনা। আবির্ভাবের ধনকে সাধনের দ্বারা তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। মালিনী করে নাই, কেহ তাহাকে বলিয়াও দেয় নাই। তাহার গুরু কাশ্যপ তখন তীর্থপর্যটনে নিষ্ক্রান্ত; তিনি উপস্থিত থাকিলেও শিষ্যাকে হয়তো সতর্ক করিয়া দিতে পারিতেন।

চতুর্থ দৃশ্যে যে-মালিনীকে দেখি, আবির্ভাবের দীপ্তি তাহার ললাট হইতে অপগত, আর সেইসঙ্গে তাহার পূর্বতন লোকচালন-ক্ষমতা, সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান সমস্তই অপস্থত। সে এমনই অসহায় যে, পূর্বতন শত্রু সুপ্রিয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হইতেও অক্ষম। ইহাকেই বলিয়াছি মালিনীর অবনমন।

মালিনীর চরিত্রের অবনমন-পরিকল্পনাতেই কবিত্বের পরা কাষ্ঠা। মানব-মনোজ্ঞ মহাকবির দ্বারাই একমাত্র ইহা সম্ভব। সেই সম্ভাবনার পরিণাম মালিনী-চরিত্র।

প্রথম দৃশ্যে মালিনীর মুখে নবধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহিষী বলিতেছেন—

শুনিলে তো মহারাজ ? এ কথা কাহার ?
শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কি বালিকার ?
এই কি তোমার কন্যা ? আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে ?

রাজা বলিতেছেন—

যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়। কন্যা জ্যোতির্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ।

দেখা যাইতেছে কন্যার অপূর্বতায় পিতামাতা উভয়েই মুগ্ধ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখিতে পাইব, মালিনীর অকস্মাৎ দর্শনে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণও সমান মুগ্ধ—

এ কী অপরূপ রূপ! এ কী স্নেহজ্যোতি
নেত্রযুগে !

তাহারা ভাবিয়াছিল, স্বর্গের দেবী ভক্তের আহ্বানে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন শুনিল যে তাঁহারই নির্বাসনের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন তাহারা বলিয়া উঠিল—

ধিক্ পাপ-রসনায় !
শত ভাগে ফাটিয়া গেল না বেদনায়—
চাহিল তোমার নির্বাসন !

সকলে সমবেত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

জয় জননীর !
জয় মা লক্ষ্মীর ! জয় করুণাময়ীর !

সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারি মালিনীর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে কোথাও একটা অলৌকিক কিছু আছে। সে-অলৌকিকত্ব আবির্ভাবজাত।

চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর সে-ব্যক্তিত্ব আর দেখি না। সে তখন উপবন ছাড়িয়া এবং সুপ্রিয়কে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে অনিচ্ছুক। জনতার সম্মুখে দাঁড়াইবার

শক্তি তাহার চলিয়া গিয়াছে। এখন সে সুপ্রিয়কে বন্ধু ও মন্ত্রগুরু হইবার জন্য মিনতি করিতেছে; সুপ্রিয়-রূপ যষ্টিখানাকে ভর করিয়া ছাড়া চলিতে সে এতই অশক্ত। আর চূড়ান্তভাবে সুপ্রিয়ের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব যখন আসিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন—

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরি নাই আর।
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি; বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল— দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে।

এখানেই মালিনীর চরিত্রে চূড়ান্ত অবনমন। আকাশের চন্দ্র ছিঁড়িয়া পড়িয়া উদ্যানের চন্দ্রমল্লিকায় পরিণত হইল। চন্দ্র অধিকতর সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা যে মানুষের নিজের। পুরোভাগের মালিনীর ছবি পটে বাঁধাইয়া রাখিবার যোগ্য— প্রান্তভাগের মালিনী যে একেবারে ঘরের মেয়ে। যাঁহারা দেবী চৌধুরানীর পুকুরঘাটে বাসনমাজার দৃশ্যকে অবাস্তব বলিয়া থাকেন তাঁহারা এবারে কী বলিবেন?

মালিনীর অবনমন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি বোঝা যায় না মালিনীর নবধর্ম কত উর্ধ্বোত্থিত? সে-তুঙ্গতায় কেহ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। সংসারে যেমন নবধর্ম আছে, তেমনি মাধ্যাকর্ষণও তো বিদ্যমান। বস্তুত মাধ্যাকর্ষণে টানিয়া নামায় না, ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়; মাধ্যাকর্ষণে মালিনীকে যত বেশি নীচে নামাইয়াছে, তাহার নবধর্মকে কি তত বেশি উর্ধ্বে উঠাইয়া দেয় নাই? মালিনী নিজে নামিয়া পড়িয়া নবধর্মকে উচ্চতর লোকে উঠিতে মুক্তি দিয়াছে, বেলুনের ভারা খসিয়া গিয়া তাহাকে ঠেলিয়া যেমন আরও উঁচুতে তুলিয়া দেয়। কবি এক অপূর্ব কৌশলে মালিনীর আদর্শের জয়ঘোষণাই করিয়াছেন। এ-কলাকৌশল মহাকবি ছাড়া আর কাহারো কল্পনায় আসিত না।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বাং লা প্র বা দ ব লে যে, রামচন্দ্রের জন্মের আগে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। প্রবাদের অনেকটা অংশ বাদ দিয়া লইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ভাবসত্য বাস্তবসত্যের পূর্বজ। ভাব রূপে আজ যাহা স্রষ্টিকর্তার মনে বিরাজিত, আগামী-কাল তাহাই বাস্তব রূপে জগতে দৃশ্যমান। অনেকে মনে করেন যে, রুশ সমাজে 'নিহিলিস্ট' দেখা দিবার আগেই টুর্গেনিভের 'ফাদার অ্যাণ্ড সন্স' উপন্যাসে তাহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এ-কথা কতদূর সত্য বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। তবে এই সত্যের একটি ঘরোয়া দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' নাটকের অন্যতম প্রধান পাত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা বলিতেছি। পরিত্রাণের পূর্বরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রকাশকাল ১৯০৯ সাল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে গান্ধিজির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে সত্য, অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি যে-সব লীলা সকলে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, যাহার সুফল এখন সকলে ভোগ করিতেছেন— তাহারই আভাস দেখিতে পাওয়া যায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ও কীর্তিতে। আজ যে-পাঠক 'পরিত্রাণ' নাটক পড়িবেন তাঁহার কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগী বাস্তবের প্রতিফলন, কিন্তু গান্ধিজির আবির্ভাবের পূর্বের পাঠকের কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিল স্রষ্টিপূর্ব আভাস। সেদিনের পাঠক হয়তো চরিত্রটিকে অবাস্তব মনে করিয়াছেন— আজকার পাঠক তাহাকে কী মনে করেন? আর যাহাই করুন অবাস্তব মনে করেন না, হয়তো মনে করেন যে বাস্তবসত্য শিল্পসত্যকে কত পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের মাধবপুর নামে একটি পরগনা ছিল। ধনঞ্জয় বৈরাগী সেখানকার লোক। মাধবপুর পরগনা যশোর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, সেখানকার প্রজাগণ বিদ্রোহ করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীর পরামর্শে যুবরাজ উদয়াদিত্যকে মাধবপুরের শাসনকর্তারূপে পাঠানো হইয়াছে। যুবরাজের সহৃদয় শাসনে প্রজারা বশীভূত। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ধারণা, সহৃদয়তা ও রাজ্যশাসন পরস্পরবিরুদ্ধ— তাই তিনি যুবরাজকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এদিকে মাধবপুরে

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। যুবরাজ থাকিতে তাহাদের ভয়ের কারণ ছিল না, তিনি খাজনা আদায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজের অপসারণের পরে কে আর তাহাদের আশ্রয় দেয়? রাজার আদেশে জোর খাজনা আদায় চলিতে লাগিল— প্রজারা ভয়ে খাজনা দিতে উদ্যত, ধনঞ্জয় তাহাদের নিষেধ করিল; সে প্রজাদের বুঝাইয়াছে যে, রাজা খাজনা চাহিলে তাহাকে বলিতে হইবে—

'ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।'

প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে এই কথাটাই আরও বিশদভাবে ধনঞ্জয় বলিয়াছে—

'আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

'প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

'ধনঞ্জয়। হাঁ, মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই— প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি— তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।'

ধনঞ্জয়ের খাজনা না দিবার যুক্তি হইতে তাহার জীবনতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। দুর্ভিক্ষে খাজনা বন্ধ করিবার তথ্যটা নূতন নয়, কিন্তু ধনঞ্জয়ের যুক্তিটা অভিনব। খাজনা বন্ধের আন্দোলন এখানে রাজনীতিক কর্মপন্থা মাত্র নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। এ খাজনা বন্ধ নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র নয়— ধর্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে; আবার এ খাজনা বন্ধ রাজাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেও নয়, তাহাকে নরহত্যার পাপ হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে। ধনঞ্জয়ের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানুষের কর্তব্য কেবল নিজের প্রতি নয়, যে-ব্যক্তি অপর পক্ষে— তাহার প্রতিও কর্তব্য রহিয়াছে।

গান্ধিজি ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে বলিয়াছিলেন সে কি কেবল ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই? তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে ইংরাজেরও মঙ্গল হইবে,

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

কেননা অত্যাচার ও অত্যাচারের ফলে দুই পক্ষেরই মনুষ্যত্ব নষ্ট হইতে থাকে।

মাধবপুরের প্রজারা যুবরাজের প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করিবার আশায় রাজধানীতে আসিয়াছে, সঙ্গে আসিয়াছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। অনেকদিন হইতে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আটক করিবার ইচ্ছা ছিল প্রতাপাদিত্যের মনে, এবারে সুযোগ পাইয়া তিনি তাহাকে কয়েদ করিলেন। প্রজারা যুবরাজকেও পাইল না, ধনঞ্জয়কে হারাইল।

ধনঞ্জয়ের উৎসাহে ও পরামর্শে প্রজারা খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছে— কিন্তু সকলেই জানে যে, এজন্য রাজার মার সহ্য করিতে হইবে। কাজেই মূল পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবার জন্য প্রজাদের কানে বৈরাগী অভয়মন্ত্র দিয়াছে। সে প্রজাদের বুঝাইয়াছে যে, ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে না, আগাইয়া আসিয়া মারটাকে বুক পাতিয়া লইতে হইবে। অত্যাচারীর আঘাত বুকে পিঠে সর্বত্র পড়িতে পারে। আঘাত যেখানেই লাগুক, ভয় না করিলেই মারের বিষদাঁত আপনি ভাঙিয়া যায়। অনিচ্ছায় যে মার খায়, ভয়ে যে মার সহ্য করে সেও তো অত্যাচারীর মতোই অপরাধী। প্রজারা এতদূর বুঝিতে পারে, কিন্তু তারপরেই গোলমাল! তারা বলে, 'ঠাকুর, তোমার গায়ে হাত দিলে সহ্য করতে পারব না!' ধনঞ্জয় বৈরাগী বলে—

'আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন, কত মার খেলেন, কত ধুলো মাখলেন—'

প্রজারা রাজধানীতে আসিবার সময়ে হাতিয়ার লইয়া আসিতে চাহিয়াছিল; ধনঞ্জয় বৈরাগী বলিয়াছিল— হাতিয়ার ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদের না আসাই উচিত। ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষা এই যে, মারের বদলে মার দেওয়া চলিবে না, মারকে সাহসের সঙ্গে সহ্য করিতে হইবে, আর যে মারিতেছে সে যে মানুষের গায়ে আঘাত করিতেছে না, আঘাত যে প্রাণের ঠাকুরের গায়ে লাগিতেছে, সেই কথাটা অত্যাচারীকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে দেবঘাতী অপকার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যতক্ষণ সে-চেষ্টা সফল না হয়, সাহস অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছায় মার খাওয়াই ধর্মকার্য।

গান্ধি-চরিত্র অবগত হইবার পরে এ-সব কথা এখন সকলেই জানিয়াছেন;

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ১৯০৯ সালে এ-সত্যকে হয়তো অধিকাংশ পাঠকেই জীবনপরাঙ্মুখতা মনে করিতেন, হয়তো কবির অবাস্তব কল্পনা মনে করিতেন। আরও মনে রাখিতে হইবে ১৯০৯ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সে-আন্দোলনের তত্ত্ব ধনঞ্জয় বৈরাগীর তত্ত্বের অনুকূল নয়। তখনকার পাঠক কবির ধনঞ্জয়-তত্ত্বকে কী দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহা জানিবার কৌতূহল এখন পাঠকের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

এত নাম থাকিতে কবি ধনঞ্জয় নামটা বাছিয়া লইলেন কেন? একটি উদ্ভট শ্লোকে আছে যে, ধনঞ্জয় নামক ব্যক্তিটিকে প্রহার করিয়া দূর করিতে হইয়াছিল। তাহারই প্রতিবাদে কি এই নামটির নির্বাচন? কবি কি বলিতে চান যে, এমন ধনঞ্জয়ও থাকিতে পারে প্রহার করিয়া যাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না, কিংবা প্রহারটাই ঠিক সেই পন্থা যাহাতে নিশ্চিন্ত সে নিবৃত্ত হইবে না?

ধনঞ্জয় প্রজাদের অভয়মন্ত্রের সঙ্গে আনন্দমন্ত্রও দিয়াছে। সেই আনন্দের প্রকাশ গানে আর নৃত্যে। মাধবপুরের দলের শক্তি বাহুতে নয়, কণ্ঠে। মার যখন বেদম পড়ে তখন তাহারা গান গায়—আর যে-পায়ের সাহায্যে ভীরুরা পলায়ন করে সেই পা দুটাকে তাহারা নাচের কাজে লাগাইয়া দেয়।

সন্দিগ্ধ পাঠক ইহাকেও বোধকরি একটা কবিকল্পনা মনে করেন? কিন্তু ইহারই বৃহত্তর রূপ, বাস্তবতর রূপ কি আমাদেরই জীবনকালে ভারতবর্ষে ঘটিয়া যায় নাই? এবারে আর মাধবপুর পরগনা মাত্র নয়—সুবিশাল ভারতবর্ষ এই ভাবোদ্বেলতার ক্ষেত্র! 'হম যব যাত্রা সুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে': গান্ধিজির যষ্টির তালে-তালে উৎকট মারের মুখে সমস্ত ভারতবর্ষ কি নাচে নাই? জাদুকরের যষ্টির ইঙ্গিতে ত্রিশকোটি নরনারী কি আশায় আনন্দে অভয়ে উদ্বেল হইয়া ওঠে নাই? সকলে দেখিতে পাইল না, কারণ সকলেই যে নাচের দলভুক্ত! যে দেখিবে সে দূরে থাকিয়া দেখিবে। ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকরা, কবিরা দূর হইতে গান্ধি-পরিচালিত ভারত-নৃত্য দেখিয়া বিস্মিত হইবে, মুগ্ধ হইবে—যেমন আজকার আমরা হই চারশত বৎসর আগেকার বাংলাদেশ-জোড়া আর-একটি দিব্য নৃত্য স্মরণ করিয়া। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব, গান্ধিজি বৈষ্ণব, আবার ধনঞ্জয়ও বৈষ্ণব—তিনজনেই বৈরাগী।

এই বৈরাগ্য-ব্যাপারটাকে পাশ্চাত্ত্যদেশ ভালো বুঝিতে পারে না; বিশেষ, বৈরাগ্য যখন ধর্মাচরণের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করে। গান্ধিজি সাধুপুরুষ, আবার রাজনীতিকও বটেন; ধনঞ্জয় বৈরাগী-মানুষ, আবার রাজনীতিকও বটে। ইউরোপের চোখে ইহা কী বিসদৃশ! কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে বৈসাদৃশ্য কিছুই নাই। জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখিলে রাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি সমস্তই অঙ্গাঙ্গি হইয়া পড়ে। আর সমস্ত পৃথক-পৃথক কোঠায় ভাগ করিয়া দেখিলে সমস্তই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। পূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্তই তো এক জীবনসত্তার অন্তর্গত। ইউরোপ এ-কথাটা এখনো ভালো বুঝিতে পারে নাই, তাই তাহার রাজনীতিকের পক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে বাধে না, তাই ব্যক্তিগত আচরণে সাধু হইয়াও সমষ্টির কল্যাণসাধনক্ষেত্রে অসাধুতা করিতে তাহার দ্বিধাবোধ হয় না। যথার্থ ভারতীয় দৃষ্টির কাছে এমন খণ্ডদর্শন অবাস্তব। ভারতীয় দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ এক অভিন্ন সত্তার অন্তর্গত। তাই গান্ধিজির কাছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি— সমস্তই মূল ধর্মনীতির অঙ্গীভূত। অখণ্ড দৃষ্টিকে আয়ত্ত করিতে গেলে কোনো খণ্ডসত্তার সঙ্গে নিজেকে আসক্ত করিয়া ফেলা চলে না— সমস্তকে যে স্বীকার করিবে সমস্ত হইতে তাহাকে অনাসক্ত থাকিতে হইবে। ইহারই অপর নাম বৈরাগ্য। তাই ধনঞ্জয়ের 'বৈরাগী'-অভিধা সার্থক।

'পরিত্রাণ' নাটকের শেষাংশে দেখিতে পাই যে, ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের ত্যাগ করিয়া উদয়াদিত্য ও বিভা প্রভৃতির সঙ্গে যাত্রা করিল। অনেকে ইহাকে ধনঞ্জয়ের পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ মনে করিতে পারেন— লোকটা তো বেশ, সকলকে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল! এমন যাহারা ভাবেন ধনঞ্জয়ের জীবনতত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারেন নাই। ধনঞ্জয় প্রজাদের এই শিক্ষাই দিয়াছিল যে, পরের মই লইয়া গাছে চড়া চলিবে না, গাছে যদি একান্তই চড়িতে হয়, নিজের মই নিজে তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। এবারে 'মই' শব্দটির পরিবর্তে 'আত্মশক্তি' শব্দটা ব্যবহার করিলেই বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। ধনঞ্জয় প্রজাদের আত্মশক্তি উদ্বোধন করিয়া দিয়াছে— এখন আর তাহার থাকিবার কী প্রয়োজন? বরঞ্চ এখন তাহার সরিয়া পড়াই দরকার, নতুবা আত্মশক্তির পরীক্ষা বাকি থাকে। ধনঞ্জয়ের সরিয়া পড়িবার বিশেষ

সার্থকতা আছে— না সরিয়া পড়িলেই অনুচিত হইত। তাহা ছাড়া, উদয়াদিত্য ও বিভার কাছে থাকা তাহার বিশেষ প্রয়োজন।

সংক্ষেপে ধনঞ্জয়ের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম— কিন্তু ধনঞ্জয়-চরিত্র সংক্ষেপে সারিবার নয়, কেননা গান্ধিবাদ, গান্ধি-রাজনীতির সহিত ধনঞ্জয়-চরিত্রের নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সে-চেষ্টা করিলে পাঠকসমাজ

বসন্ত রায়

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর নামে একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। নামান্তর সত্ত্বেও ব্যক্তি যে একই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহারা সকলেই একই ছাঁচে গড়া, এমনকি ইহাদের উল্লেখ করিতে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর ছাড়া আর-কোনো বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন কবি বোধ করেন নাই। কেবল 'মুক্তধারা'-'রক্তকরবী'তে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মুক্ত-ধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী আর রক্তকরবীর বিশু পাগল, ঠাকুরদা-চরিত্রেরই রূপান্তর, নামান্তর তো বটেই। কিন্তু ঐ নামের বিশিষ্টতাটুকু বাদ দিলে দেখা যাইবে যে ইহারা ঠাকুরদা-চরিত্রেরই রকমফের, ঠাকুরদা-চরিত্রের সমস্ত গুণই ইহাদের মধ্যে বর্তমান।

ঠাকুরদা-চরিত্রের বিশেষ গুণ কী? নির্বিশেষই ইহাদের বিশেষ গুণ! ইহাদের জাতি কুল বংশপরিচয় কিছুই নাই; আগে উল্লিখিত চরিত্র-দুটির নাম বাদ দিলে কাহারো ব্যক্তিগত নাম অবধি নাই। যে-সব পরিচয়ের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া মানুষ বিশিষ্ট হইয়া ওঠে, ইহাদের মধ্যে তাহাদের কিছুই নাই। 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছে যে, এক সময়ে তাহার গৃহে পুত্র-পরিবার সবই ছিল। কিন্তু সে-অবস্থা নাট্যবিষয়ের বহির্ভূত কালে— নাটকে তাহাকে নির্বিশেষ অবস্থাতেই পাই। সংসার ত্যাগ করিবার পরে সন্ন্যাসীর অঙ্গ হইতে যেমন পূর্ব-আশ্রমের সমস্ত পরিচয় ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তখন যেমন সে সন্ন্যাসীমাত্র,

ঠাকুরদাও সেইরূপ। ঠাকুরদা মুক্ত জীব। কোনোপ্রকার বিশেষের সহিত সে সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়াই সে সকলের সহিত নির্বিশেষে মিলিতে পারে। ঠাকুরদার নির্বিশেষ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে শ্রেণীরূপের প্রতীক মনে করিলেও ভুল হইবে। শ্রেণীরূপকেও সে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে— সে সকল শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত, সে সার্বজনীন জীব, এইজন্যই শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বহির্ভূত মানবের সুখ-দুঃখকে অনুভব করা তাহার পক্ষে অনায়াস।

নাটকে অনেক শ্রেণীর, অনেক ধরনের লোক আছে— তাহাদের সুখদুঃখের হেতুও বিচিত্র। তৎসত্ত্বেও যে ঠাকুরদা সকলের বেদনার অংশিদার, তার কারণ সে নাটকের মূল রসের কেন্দ্রে অবস্থিত, কিংবা তাহাকে মূল রসের ভাণ্ডারি ও নাটকীয় ঘটনার কাণ্ডারি বলা যাইতে পারে। কিংবা সে আরও বেশি। সে নাটকের দর্শকগণেরও প্রতিনিধি। তাহার মুক্তি ও সার্বজননীতা এতই অবাধ যে, অনায়াসে সে যুগপৎ নাটকীয় পাত্রপাত্রী ও নাটকের দর্শকগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ। কিংবা ইহাও বুঝি যথেষ্ট নয়, স্বয়ং নাট্যকারেরও সে প্রতিনিধি। নাটকের পাত্রপাত্রী ও দর্শকগণের যেভাবে নাটকটিকে গ্রহণ করা উচিত ঠাকুরদা তাহারই মুখপাত্র। সে আদর্শ দর্শক। আর নাট্যকার যেভাবে নাটকটি ব্যাখ্যা করিতে চান, ঠাকুরদা তাহাই করিতেছে। সে নাটকের আদর্শ ব্যাখ্যাতা। ঠাকুরদাকে বাদ দিলে নাটকের ঘটনা-বিন্যাসের হয়তো বিশেষ ত্রুটি হয় না। কিন্তু ভাবনা-বিন্যাসের রঙ একেবারে বদলিয়া যায়। আমাদের দেশের যাত্রাগানে জুড়ি এবং গ্রীক নাটকের কোরাস যে-কাজ করে, ঠাকুরদার কাজ অনেকটা সেইরূপ।

এ-হেন ঠাকুরদা-চরিত্রের বিবর্তনের ইতিহাস রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্বযুগে লিপিবদ্ধ আছে। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে বসন্ত রায় নামে যে-ব্যক্তিটি আছে, পরবর্তী কালে লিখিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে যাহাকে দেখিতে পাই, সেই বসন্ত রায়কেই ঠাকুরদা-চরিত্রের পূর্বরূপ বা অপরিণত রূপ বলিয়া আমার মনে হয়। বসন্ত রায়ের সংসার হইতে বিবিক্ত ভাব, সার্বজনীন সমবেদনা, সংগীতানুরক্তি, সুখদুঃখে অটল সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ ঠাকুরদা-চরিত্রের গুণের অনুরূপ। পরবর্তী কালে আসিয়া এইসব গুণ বাড়িয়াছে, বসন্ত রায়ের অঙ্গে স্থান-কাল-পাত্র-শ্রেণী-সম্প্রদায় প্রভৃতির যে-সব চিহ্ন বর্তমান তাহা ঝরিয়া গিয়াছে— ফলে ঠাকুরদা-চরিত্রটি পূর্ণবিবর্তিত হইয়া দেখা দিয়াছে। এ বসন্ত রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও

পদাবলি-লেখক কিনা, নাটকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক কেবল তাহার সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু আর-একটা প্রশ্ন ওঠে, নাটকের বসন্ত রায়ের কোনো পূর্বরূপ ছিল কি না? বাস্তবে ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে শ্রীকণ্ঠ সিংহের চিত্র আঁকিয়াছেন, সেই শ্রীকণ্ঠ সিংহকেই বসন্ত রায়ের ও পরবর্তী কালের ঠাকুরদা-চরিত্রের পূর্বতম বাস্তবরূপ বলিয়া মনে হয়। শ্রীকণ্ঠ সিংহ ভক্ত ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন, সকলের সুখদুঃখের অংশিদার ছিলেন, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে তাঁহার সাম্যবন্ধন ছিল, আর সংগীতে ছিল তাঁহার একান্ত অনুরাগ। এ-সমস্তই বসন্ত রায়ের ও ঠাকুরদার চরিত্র-লক্ষণ। তার উপরে যখন মনে পড়ে যে শ্রীকণ্ঠ সিংহ বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছেন, তখন অস্পষ্ট ধারণা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়। ঠাকুরদা-চরিত্রের রহস্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের নাটকগুলি বুঝিয়া ওঠা কঠিন, আর ঠাকুরদা-চরিত্রকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করিতে হইলে বসন্ত রায় হইয়া বাস্তব জগতের শ্রীকণ্ঠ সিংহ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতে হইবে। একদিক বাস্তব জগৎ আর-একদিকে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের নাটকের নির্বিশেষ জগৎ— মাঝখানে রহিয়াছে বসন্ত রায়। দুই জগতের কিছু-কিছু পরিচয় তাহাতে বর্তমান। সে বিশেষ বটে কিন্তু নির্বিশেষ হইবার মুখে চালিত, সে ঠাকুরদা-ভাবাপন্ন বটে কিন্তু এখনো ঠাকুরদা হইয়া ওঠে নাই, তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দুই জগতেরই সন্ধান মেলা সম্ভব। ইহাই বসন্ত রায় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব।

বিনোদিনী

বিনোদিনীর মতো নারী চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল; বিরল এইজন্য যে, দেবযানী, রুক্মিণী ও বাঁশরি সরকার বিনোদিনীর সগোত্র হইলেও এই-শ্রেণীর নারীচরিত্র অঙ্কন কবির স্বভাবসংগত নয়। বিনোদিনীকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন শরৎচন্দ্রের কোনো অলিখিত উপন্যাসের নায়িকা। কিংবা বলা উচিত

যে— যেহেতু 'চোখের বালি'র আগে শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাস লিখিত হয় নাই— শরৎচন্দ্রের অনেক নারীচরিত্রই বিনোদিনীর ধাতুতে গঠিত।

বিধবা বিনোদিনী হঠাৎ মহেন্দ্রের ভরা সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদিনী রূপবতী, যুবতী, নানা গুণময়ী, তার উপরে এক সময়ে মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিবাহের একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। বিলুপ্ত সেই বিস্মৃতপ্রায় সূত্র যেন এই সংসারের উপরে মহেন্দ্রের উপরে তাহার একপ্রকার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। যে-সিংহাসনে একদা সে বসিলে বসিতে পারিত, তাহাকে সে সবলে আঘাত করিল, মহেন্দ্র ও আশালতার সংসার নড়িয়া উঠিল। এখানে আর-একটা নূতন সূত্র যুক্ত হইয়া বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সে মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী। বিহারী মহেন্দ্রের আসক্তি হইতে মুক্ত— সে বিনোদিনীকে দূরে রাখিতে কৃতসংকল্প, আর দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তাহার সহিত স্বাভাবিক ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা করিয়া চলিয়াছে। বস্তুত মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও বিহারীকে লইয়াই আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণের ত্রিভুজ গঠিত— আশালতা একেবারেই অবান্তর। ত্রিভুজের স্বভাবই এই যে, সে ক্রমাগত চরকির মতো পাক খাইতে থাকে— অন্তত একটা ভুজ খসিয়া না-পড়া অবধি তাহার শান্তি নাই। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্ররূপ ভুজটি খসিয়া পড়িয়াছে— তখনই বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র, বিহারী ও অন্যান্য সকলের সম্বন্ধ পুনরায় সংসারের স্বভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে। অসামাজিক কামনার স্থান সংসারে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের মনেও থাকিবে না এমন নয়। যাহা মনে আছে কোনো সময়ে তাহা বাহির হইয়া পড়িবেই— তখন তাহাকে সামলাইবার উপায় কী? সে উপায় ঐ মনের হাতেই আছে। বিনোদিনী যখন জানিল যে, বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত, তখনই তাহার ক্ষুব্ধ আত্মসম্মান শান্ত হইল এবং মনের দিক হইতে যাহা মিলিল তাহাকে হাতে পাইবার উদ্দেশ্যে আর আকুলতা প্রকাশ করিল না। এখানেই বিনোদিনীর ও লেখকের কৃতিত্ব। কিন্তু অনেক পাঠক ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর বিবাহ হইয়া গেলেই বোধকরি তাঁহারা খুশি হইতেন। সংসারে এমন হইলেও শিল্পে কদাচিৎ এমন ঘটে— ইহাতেই বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য।

বিনোদিনীর উত্তপ্ত যৌবনজ্বালাময় প্রকৃতির গূঢ় মর্মস্থলে একটি সজল কোমল

পূজা-নিবেদিত নারীপ্রকৃতি ছিল। সমস্ত উপন্যাসের গতি সেই নারীপ্রকৃতিকে মুক্তিদানের দিকে যাত্রা করিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

'বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল ; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস-কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীস্ত্রী ভাবে একান্ত ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই— আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে। বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন ; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে, সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।'

'চোখের বালি' উপন্যাসের, যুবতী বিনোদিনীর, মর্মকথা উদ্ধৃত অংশে কবি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। মদনের পঞ্চশর বিনোদিনীর হৃদয়ে যে-অগ্নি জ্বালিয়াছিল, যে-অগ্নিতে মহেন্দ্রের সংসার ভস্ম হইতে পারিত, সেই অগ্নিকে কবি শান্ত করিয়া, সংযত করিয়া গৃহের মঙ্গলদীপে পরিণত করিয়াছেন। বাস্তবতার নামে স্বভাবের আগুনকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া দাবানল বাধাইয়া বসা রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্মসংগত নয়— এটাই বোধ হয় আধুনিকেরা পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজি নহেন। কিন্তু শেষের পরেও তো আর-একটা শেষ আছে। দাবানল যত প্রচণ্ডই হোক এক সময়ে

তাহারও অবসান ঘটে— তখন কি তাহার ভস্মস্তূপ বৈরাগ্যের বাণী বহন করে না? রবীন্দ্রনাথ যদি সেই বৈরাগ্যের ইঙ্গিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয় যে তিনি শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজি নহেন। বাস্তববাদীগণের পরিকল্পিত শেষের পরে যে আর-একটা অতি-শেষ আছে— রবীন্দ্রনাথ ততদূর যাইতে সম্মত। বাস্তববাদীরা পথকেই গৃহ ভাবিয়া মনে করে যে চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম। কিন্তু যে-ব্যক্তি পরবর্তী স্তরকে দেখিয়াছে, সে জানে পথের পরে গৃহ, চঞ্চলতার পরে বিরাম। বাস্তববাদী অর্ধদর্শী— সমগ্রদর্শী ব্যক্তিকে আইডিয়ালিস্ট বলি, বাস্তবোত্তরবাদী বলিতেও বাধা নাই।

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে একটি উপকাব্য আছে; এই কাব্যটিতে নারীর বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব অনুসারে নারীর বিভিন্ন রূপ ইহাতে প্রদর্শিত। রবীন্দ্রনাথ-চিত্রিত নারীসমাজের কতখানি এইসব বর্ণনার সঙ্গে মেলে তাহা একটা কৌতূহলজনক আলোচনার বিষয়। বিনোদিনী-চরিত্র কবিকল্পিত 'নাগরী'-পর্যায়ের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মেলে— এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবি বলিতেছেন—

সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান্ খান্
অট্টহাস্যে আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয় ;
মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।

মহেন্দ্রের সম্বন্ধে বিনোদিনীর আচরণ স্মরণ করিলে এই বর্ণনার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। মহেন্দ্রকে সে লুব্ধ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তাহাকে পুষ্পসৌরভে উতলা করিয়া দিয়াছিল নিশ্চয়— কিন্তু অদৃশ্য আগুনে তাহার কুঞ্জ পরিবেষ্টিত, মহেন্দ্র প্রবেশের পথ পায় নাই— এবং মোহমন্ত্রে তাহার হৃদয় বিজিত হইলেও বিনোদিনীর

নির্দয় অবজ্ঞা ব্যতীত আর-কিছুই তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। ইহার সহিত তুলনায় নির্বিকারকল্প বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর আচরণ ও মনোভাব কত পৃথক! কবি বলিতেছেন—

আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে ;
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।

বিহারীর পায়েই এই নাগরী আপন চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। বিনোদিনী—

প্রসাধন-সাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গিতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।

বিধবা বিনোদিনীর সাজসজ্জা, স্বল্প প্রসাধনের সুনিপুণ দক্ষতা এবং বিরল ভূষণের সংকেতময় ভঙ্গিতে উপরের কাব্যাংশের সার্থকতা বুঝাইয়া দেয়। আর—

জাদুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।

মহেন্দ্রের সহিত তাহার ব্যবহার স্মরণ করিলে উদ্ধৃত কাব্যসত্যকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

তবু উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে বিনোদিনীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না, ইহাই তাহার সম্পূর্ণ রূপ হইলে চোখের বালির উপসংহার অন্য রকম হইত। বিনোদিনীর প্রকৃতির গভীরে একটি সেবাপ্রয়াসী সলজ্জ মাতা ও পত্নী স্তিমিত ছিল। ঘটনাচক্রে তাহার অতৃপ্ত প্রণয়পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু

ঘটনাচক্রই শেষ পর্যন্ত তাহার স্তিমিত প্রকৃতিকে গৃহদীপের মতো অচঞ্চল, স্নিগ্ধ শিখায় পরিণতি দান করিয়াছে। 'নাম্নী' উপকাব্যের 'শামলী' কবিতাটি হইতে বিনোদিনী-চরিত্রের উপসংহারের বর্ণনা পাওয়া যায়—

গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।

অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বভাবতই বিনোদিনী যাহা হইতে পারিত, ঔপন্যাসিক যাহার আভাস দিয়াছেন— কবির কলমে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

আনন্দময়ী

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় আক্ষেপ করিয়াছেন যে, জীবনে মার স্নেহ ও সঙ্গ অল্পই পাইয়াছেন, সেইজন্যই তিনি স্থান পান নাই তাঁহার সাহিত্যে। এ-আক্ষেপ সর্বৈব সত্য নয়। কেননা রবীন্দ্রসাহিত্যে জননীর বাস্তব চিত্র বিরল নয়। 'নৌকাডুবি'তে, 'চোখের বালি'তে মা আছেন; 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্পে আছেন, 'শেষের কবিতা'য় যোগমায়ারূপে আছেন, আরও অন্যত্র অন্য নামে আছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া আছেন গোরা উপন্যাসে। গোরার মা আনন্দময়ী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ জননী-চিত্র। আনন্দময়ী মাতৃমূর্তির পূর্ণতম, প্রত্যক্ষতম, ঘনীভূততম প্রকাশ। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে মাতৃরূপের যে-সব চিত্র দেখিতে পাই, তন্মধ্যে একমাত্র গান্ধারীর সঙ্গেই আনন্দময়ীর তুলনা চলে। দু-জনেরই জীবন অবিচলিত সত্যাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দু-জনেরই অপরিমেয় সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা, দু-জনেরই মূর্তি আর-সকলের উপরে সগৌরবে উত্থিত, কেহই আর যেন পরিবারমাত্রের মাতৃস্থানীয়া নন, দু-জনেই যেন 'জনক-জননী-জননী'। গান্ধারী

শতপুত্রবতী, তবু তাঁহার পুত্রগৌরব পরিতৃপ্ত হয় নাই ; বেদব্যাস গান্ধারীর যোগ্য পুত্র সৃষ্টি করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উচিত ছিল গোরার মতো একটি পুত্রকে গান্ধারীর কোলে স্থাপন করা। অযোগ্য পুত্রের মাতা হওয়ার দুঃখই গান্ধারীর জীবনের চরম দুঃখ। আর আনন্দময়ী অপুত্রক হইয়াও কেবল সাধনবলে গোরাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সাধনার দুঃখও বড়ো কম নয়। আপন সাধনগণ্ডির সিদ্ধির মধ্যে গোরাকে টানিয়া আনিতে তাঁহাকে সামান্য বেগ পাইতে হয় নাই ; শেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে জন্মপরিচয় গোরার পরিজ্ঞাত না হইলে খুব সম্ভব আনন্দময়ীর চেষ্টা চিরকালই অচরিতার্থ থাকিয়া যাইত। দৈবের হস্তক্ষেপের ফলে গোরা বুঝিতে পারিল যে, ভারতবর্ষ তাহার যেমন ধাত্রী, আনন্দময়ীও তেমনি তাহার জননী ; বুঝিতে পারিল যে, কেহই তাহার আপন নহে বলিয়াই তাহার সবচেয়ে নিকটতম ; বুঝিতে পারিল যে, আনন্দময়ীই ভারতবর্ষ। যে নিষ্ঠুর দৈব এতদিন দুইজনকে একস্থলে রাখিয়াও এক হইতে দেয় নাই, আজ সেই নিষ্ঠুর হস্তই গোরাকে তাহার মাতৃক্রোড়ে সবেগে নিক্ষেপ করিল। আনন্দময়ী চিরদিনের ভারতবর্ষ, গোরা আধুনিক ভারতীয় ; একজন সাধ্য, অপর জন সাধক— দৈবের অমোঘ হস্ত দুয়ে মিল ঘটাইয়া দিল। আনন্দমঠের উপসংহারের মতো গোরা-উপন্যাসের উপান্তও প্রতীকভাবান্বিত। গোরা ও আনন্দময়ীকে উপন্যাসের অধ্যায়ের প্রহরে-প্রহরে উন্নীত করিতে-করিতে লেখক তাঁহাদের একেবারে মহিমার মধ্যাহ্নশিখরে তুলিয়া দিয়াছেন, সেখান হইতে তাহাদের আর মানবমাত্র বলিয়া মনে হয় না, অসীম রহস্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতীক বলিয়া মনে হইতে থাকে। আনন্দময়ী ভারতভূমির প্রতীক।

একি আমার কেবল অনুমান মাত্র ? আমার বিশ্বাস, নয় ; আমার বিশ্বাস গোরা ও আনন্দময়ী চরিত্রকল্পনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিছক রক্তমাংসের মানুষের পরিকল্পনা করেন নাই— আর তাহাদের গড়িবার সময়ে রক্তমাংসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে প্রতীকের মিশল দিয়াছেন। প্রত্যেক সার্থক শিল্পসৃষ্টি আপন সার্থকতার দ্বারা অভীষ্ট-সীমাকে ছাড়াইয়া যায়, রক্তমাংসের গণ্ডি অতিক্রম করে— তারপরেই যে প্রতীকের রাজত্ব। প্রত্যেক মহৎ চরিত্রই, কি শিল্পে কি বাস্তবে, প্রতীকের ইঙ্গিত বহন করিতেছে : তাহাকে দেখিলে তাহাকে ছাড়া আরও-কিছু মনে পড়ে, মনে হয় ঐটুকুর মধ্যেই সে যেন সম্পূর্ণ নয়। পূর্ণ সৃষ্টির একটি লক্ষণ এই যে,

পাঠকের মনে তাহা অপূর্ণতার ক্ষুধা জাগ্রত করিয়া দিবে। আর-কিছুই নয়, আপন পূর্ণতার দ্বারাই তাহা পাঠকের অপূর্ণতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। এই অঙ্গুলিনির্দেশের ক্ষমতা প্রতীকের প্রধান ধর্ম। আনন্দময়ী চিরন্তনী ভারতভূমির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

বাস্তবিক, ভারতভূমি ছাড়া এমন সর্বংসহা আর কে? পরকে আপন করিবার এমন প্রতিভা আর কার? রক্তসম্বন্ধবহির্ভূত ব্যক্তিকে আর কে এমন করিয়া কোলে টানিয়াছে? আর, কোলের ছেলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলে এমন পরিপূর্ণ ক্ষমার সঙ্গে সহ্য করিতে, মাতৃক্রোড়কে সম্পূর্ণ অবারিত করিয়া রাখিতেই বা আর কে সক্ষম? সাধনালব্ধ সন্তান যে জঠরজাত সন্তানের চেয়ে অনেক বেশি আপন, আনন্দময়ী ও ভারতভূমি ছাড়া আর কে তাহা জানে?

আনন্দময়ী কীভাবে, কী সাধনমার্গ অনুসরণের ফলে সিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছেন আমরা জানি না, আমরা যখন তাঁহাকে দেখি, একেবারে আদর্শের পূর্ণতাতেই দেখি। কিন্তু নিশ্চয় একটা দুঃসহ দুঃখময় সাধনার পর্ব তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষকেও অনুরূপ একটা পর্ব পার হইতে হইয়াছে—ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু আমরা দু-দিনের প্রাণী, সে-সব পূর্বেতিহাসের কী জানি, আমরা আনন্দময়ী ও ভারত-ভূমিকে ধৈর্যের প্রতিমারূপেই চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি।

গোরা আনন্দময়ীকে মাতৃজ্ঞানে ভালোবাসিত, কিন্তু তাহার মা যে মাতৃভূমির প্রতীক এ-ধারণা তাহার ছিল না—কেমন করিয়া থাকিবে, আত্মজ্ঞানেরই যে উন্মেষ হয় নাই। সে-বোধ হইবামাত্র গোরা আবিষ্কার করিল যে, তাহার মাতৃ-দেবী ও মাতৃভূমি এক; আবিষ্কার করিল যে, একই ভ্রান্তি উভয়কে গোরার কাছ হইতে দূরে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিল; আবিষ্কার করিল যে, তাহারই মাতৃ-ক্রোড় সমস্ত মাতৃভূমিতে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মাতৃভূমি ঘনীভূত হইয়া একটি মাতৃক্রোড়কে সৃষ্টি করিয়াছে; দৈবহস্তের পরমবিন্যাসে সে যুগপৎ জননী ও জন্মভূমিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

গোরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরেশবাবুকে বলিতেছে, 'এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা-না-একটা জায়গায় বেধেছে···আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র

আমার সামনে এসে পড়েছে, সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়, সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।'…'আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি— মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।' গোরা আনন্দময়ীকে বলিতেছে, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

দুই-ই কি এক ভাষা নয়? ভাব তো এক বটেই! দুয়ে মিলিয়া কি এক হইয়া যায় নাই? 'তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' আনন্দময়ী গোরার জননী মাত্র নন, ভারতবর্ষ বলিয়া তিনি আমাদের সকলেরই জননী এবং সেখানেই প্রতীক-ভাবান্বিতা।

গোরা ও অমিত রায়

গোরা ও অমিত রায় একই লেখকের সৃষ্ট হইলেও দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। রবীন্দ্রসাহিত্যের দুই ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করিয়া, বৃহত্তম ব্যবধান রক্ষা করিয়া, দুইটি স্বতন্ত্র যুগের প্রতিনিধি হিসাবে তাহারা বিরাজ করিতেছে। গোরা ও অমিত দু-জনেই বাঙালিসমাজের অন্তর্গত হইলেও আচারে ব্যবহারে, সাজে সজ্জায়, কথায় বার্তায়, এমনকি চেহারাটিতে অবধি তাহারা এমনই পৃথক যে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, লেখক কোনো-একটা বিশেষ উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়াই ইহাদের এমন স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন। গোরা বিদেশী হইয়াও ভারতীয় হইবার সাধনায় অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, আর অমিত রায় ভারতীয় হইয়াও সর্বজাতীয় হইবার চেষ্টায় নিজেকে কিম্ভূত করিয়া তুলিয়াছে। গোরা আর-একটু হইলেই ট্রাজিক হইতে পারিত, অমিত প্রায় হাস্যকরতার কাছঘেঁষা। গোরা বাংলাদেশের সেই আমলের লোক, কেশব সেনের বক্তৃতায় দীক্ষিত বাঙালির মন যখন চঞ্চল, বঙ্কিমচন্দ্র

যখন সাহিত্যের অধিদেবতা— রবীন্দ্রনাথ তখন কিছুকাল হইল লিখিতে শুরু করিয়াছেন। গোরার জন্ম ১৮৫৭ সালে, তার উপরে যদি আর পঁচিশটা বছর ধরা যায়, তবে তখন ১৮৮২ সাল। এদিকে অমিত রায় হাল আমলের লোক। ঠিক কোন্ আমলের অনুমান করা কঠিন নয়। সুনীতি চাটুজ্জের ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত বই দু-খানা লইয়া সে শিলঙে গিয়াছিল— বই দু-খানা তখন নবপ্রকাশিত (১৯২৬), কাজেই সময়ের একটা সীমা পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ তখন এমন সর্বজনস্বীকৃত যে তাঁর স্থান তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে। বলা চলে যে, একজন তরুণ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাংলাদেশের লোক, আর-একজন প্রৌঢ় প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের যুগের বাংলাদেশের অধিবাসী। দু-জনের সময়ের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ বছরের— দু-জনের ভাবের দূরত্ব আরও অনেক বেশি, কারণ এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে অনেকখানি ভাববিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে— গোরার বাংলাদেশ অমিত রায়ের বাংলাদেশ নয়।

এবারে গোরা বা গৌরমোহনের চেহারা ও সাজসজ্জার বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে—

'সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিতমহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের সাদা— হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো— গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; চোখের উপরে ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে, অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।'

এবারে তাহার বেশভূষার বর্ণনা— সে পরেশবাবুদের বাড়িতে আসিয়াছে— 'গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপরে ফিতাবাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।'

এবারে অমিতের চেহারার ও বেশভূষার বর্ণনা উদ্ধার করা যাক। দুটি বর্ণনার তুলনা করিলে কেবল যে গোরা ও অমিতের ব্যক্তিত্বের প্রভেদ জানা যাইবে তাহা নয়, তাহাদের ভিন্ন কালেরও স্বরূপ জানা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস।

'অমিতের নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে, পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাটকরা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর একরকমের উচ্চহাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে— কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশড্‌। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত।'

গোরা ও অমিত সম্বন্ধে আর-কিছু যদি যদি না-ও জানা যাইত, উপরের বর্ণনার

টুকরা দুটি হইতেই তাহাদের চরিত্রের চেহারার একটা আভাস পাওয়া যাইত। আগে অমিতের কথাই ধরা যাক— কবি বলিতেছেন— 'অমিতের নেশাই হল স্টাইলে।' ওই স্টাইলের চর্চার উদ্দেশ্যেই সে দেশী কাপড় পরিয়া থাকে, যেখানে যত কিছু অদ্ভুত পোশাক আছে শরীরে চাপাইয়া নিজেকে কিম্ভূত করিয়া তোলে, কেননা, স্টাইলে তার নেশা। অমিতের মতে স্টাইল কি, না, যাহাতে মানুষকে পাঁচজনের মধ্যে একেবারে পঞ্চম করিয়া তোলে।

এখন, স্টাইলের প্রতি এই উৎকট আগ্রহ কোনো ব্যক্তিতে বা সমাজে দেখা দেয় যখন বস্তুর অভাব ঘটে। তখন বস্তুর অভাব অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের অভাব, বক্তব্যভঙ্গির দ্বারা পূরণ করিয়া লইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ডন কুইক্‌সট বায়ুচালিত যন্ত্রটাকে শত্রু মনে করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল— ইহারা অর্থাৎ নিছক স্টাইল-বিলাসীরা বায়ুকেই লক্ষ্য মনে করিয়া কলমের খোঁচা মারিতে উদ্যত হয়। আমাদের বক্তব্যকে সূত্রাকারে পরিণত করিয়া বলা চলে যে, বক্তব্যের স্বল্পতা ও স্টাইলের বাড়াবাড়ি পরস্পরসম্বদ্ধ সাহিত্য হইতে একটা উদাহরণ লওয়া যাক। ভারতচন্দ্রের স্টাইল স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য কী? কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। নিজের বিদ্যা ও ভাষার সৌন্দর্যকে প্রকট করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিদ্যাসুন্দরের অবতারণা করিয়াছেন— তাই তাহারা এমন ছায়াবৎ, এমন বায়বীয়, ইহাকেই বলে বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া কলম চালনা। অন্যদিকে মুকুন্দরামকে দেখা যাক, তাঁহার স্টাইল ছিল না, কিন্তু বস্তু ছিল।— এটাও আদর্শ অবস্থা নয়, কেননা, সাহিত্যে বস্তুতে ও স্টাইলে গাঁটছড়া পড়া আবশ্যক।

অমিত রায় দ্বিযুদ্ধান্তর্বর্তী শিক্ষিত বাঙালিসমাজের অন্যতম ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এখানেই তাহার আসল বৈশিষ্ট্য। সে যতই জীবন্ত হোক-না কেন, তার আসল মূল্য মানুষ হিসাবে নয়, সামাজিক অবস্থার সাক্ষী হিসাবে। অমিত রায়ের কোষ্ঠী তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় দলিল। অমিত দ্বিযুদ্ধান্তর্বর্তী পর্বের সামাজিক তাপমান। অত্যাধুনিক সমালোচকদের ভাষায়, সে সমাজচৈতন্যধর্মের কৃষ্ণদাস কবিরাজ— তাঁহার সর্বাঙ্গে সমাজচৈতন্য-ধর্মের ফোঁটা-তিলকের ছাপ।

অমিতের যুগের সমাজধর্ম কী? অমিত 'সিনিক'; মানুষ তখনই সিনিক

হইয়া ওঠে যখন নিজের বুদ্ধি ও শক্তির অনুযায়ী কর্মের অভাব হয়। যে-বুদ্ধিকে সে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারিত, কর্মহীন সেই বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইয়া আত্ম-বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়। আত্মবিশ্লেষণের অতিশয় ঝোঁকটা ভালো নয়— যেহেতু বিশ্লেষণের চরম ফল শেষ পর্যন্ত শূন্যতা। শূন্যতা মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করে —সিনিসিজ্‌ম একরকম নাস্তিক্য। অমিত রায় বুদ্ধিবৃত্তির নাস্তিক। তাহার হাতে কাজ নাই, অথচ ঘটে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, তাই সে প্রমাণ করিতে বসিয়াছে কাজ করাটাই একটা কুসংস্কার, যেন তাহার কাজ নাই বলিয়াই কাজ না করাটাই সংসারের নিয়ম।

এই কথা স্মরণ করিয়াই অমিতকে বর্তমান যুগের বাঙালির প্রতিনিধি বলিয়াছি। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে বাঙালির হাতে কাজ ছিল, জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য মনে উৎসাহ ছিল —তখন সে সিনিক হইবার অবকাশই পায় নাই। যে-বাঙালি ডিরোজিয়োর ছাত্র, যে-বাঙালি রামমোহনের দলভুক্ত, যে-বাঙালি দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত, যাহারা কেশবচন্দ্রের অনুরাগী, রামকৃষ্ণের শিষ্য-প্রশিষ্য, সুরেন্দ্রনাথের চেলা-চামুণ্ডা— তাহারা বাহিরের কর্মপ্রবাহ লইয়াই এমন ব্যস্ত ছিল যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিলাসের সময় তাহাদের ছিল না। গোরা সেই যুগের বাঙালি। সে সমাজ সংস্কার করিতে চায়, ইংরেজ তাড়াইতে চায়, ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে চায়— সে ঘোরতর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী— ভুল হোক ভ্রান্ত হোক, একটা বিশ্বাসের দ্বারা সে চালিত। যে-উপাদানে বিধাতা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে তৈয়ারি করিয়াছিলেন, তাহারা সেই উপাদানের মানুষ। কিন্তু অমিত রায়? কালের ব্যবধানে ঘটনা-চক্রের আবর্তনে ভারতবর্ষে যখন বাঙালির প্রাধান্য কমিয়া আসিয়াছে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন অবাঙালির করগত, ব্যাবসাবাণিজ্যের লক্ষ্মী যখন বাঙালির গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, যে-বাঙালি এক সময়ে ভারতীয় চিন্তার পুরোভাগে ছিল সে যখন চিন্তার 'ক্যাম্প-ফলোয়ার'-এ পরিণত হইয়াছে, অমিত সেই যুগের লোক। তাহার বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু যখন কর্ম নাই বুদ্ধি আছে তখন সে-বুদ্ধি সর্বনাশের অর্থাৎ আত্মনাশের কারণ হইয়া বসে। তখন সে প্রমাণ করিতে বসে যে, রবি ঠাকুরের চেয়ে নিবারণ চক্রবর্তী বড়ো কবি, তখন সে প্রমাণ করিতে বসে যে, কাজ করাটা একটা বর্বরোচিত সংস্কার— তখন সে স্রোতের মুখের শ্যাওলার মতো ঘটনার

বেগে তাড়িত হইয়া কলিকাতা হইতে শিলং, শিলং হইতে নৈনিতাল করিয়া ঘুরে— কোথাও তাহার স্থিরতা নাই, কারণ স্থিরতাকে জড়তা বলিয়া তাহার বিশ্বাস। নদীর স্রোত চঞ্চল, আবার স্রোতের শ্যাওলাও চঞ্চল— কিন্তু দুইয়ে পার্থক্য আছে। গোরার চঞ্চলতা স্রোতের মতো, অমিতের শ্যাওলার মতো— এই যে ভেদ, এ কেবল তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, যে-সমাজের তাহারা মানুষ, সেই সমাজের সমষ্টিগত ব্যাপার। তাই গোরা ও অমিতকে তাহাদের বিভিন্ন যুগের সামাজিক প্রতিনিধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

নিখিলেশ ও সন্দীপ

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দুটি করিয়া প্রধান পুরুষ-চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়— বিনয় ও গোরা; নিখিলেশ ও সন্দীপ; বিপ্রদাস ও মধুসূদন। এগুলি জোড়বাঁধা চরিত্র। ভাবের সূত্রে বা বৈষম্যের সূত্রে ইহারা পরস্পর গ্রথিত। প্রথম দিকের উপন্যাসেও এ-রকম জোড়বাঁধা চরিত্রযুগল পাওয়া যাইবে— কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসের সঙ্গে তাহাদের মূলগত পার্থক্য আছে। 'চোখের বালি'র বিহারী ও মহেন্দ্র, 'নৌকাডুবি'র রমেশ ও অক্ষয় জোড়বাঁধা চরিত্র হইলেও তাহারা ব্যক্তি-রূপের অধিক নয়। পরবর্তী উপন্যাসগুলির চরিত্রযুগল কেবল ব্যক্তিরূপ নয়, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিরূপের চেয়ে শ্রেণীরূপের বিকাশই প্রবলতর। শ্রেণীরূপ বলিতে বুঝি 'টাইপ'। ইহাদের অঙ্গ হইতে নাম গোত্র প্রভৃতি পরিচয় আরও একটু স্খলিত হইয়া পড়িলে ইহারা বিশুদ্ধ symbol বা প্রতীকে পরিণত হইতে পারিত। পরবর্তী উপন্যাসের এইসব চরিত্র টাইপ ও সিম্বলের মাঝামাঝি এক-প্রকার সৃষ্টি।

সন্দীপ ও নিখিলেশ কোন্ শ্রেণীরূপ কিংবা আরও একটু নির্গুণ হইলে কিসের সিম্বল হইতে পারিত?

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পরে লিখিত হইলেও ইহার ঘটনাকাল স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তখন বন্দে মাতরম্ মন্ত্র ঘরে-ঘরে

ধ্বনিত হইতেছে, স্বদেশী বক্তৃতায় দেশসুদ্ধ লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে, হাটে-হাটে বিলাতি কাপড় ও বিলাতি লবণ বয়কট হইতেছে, যাহারা সে-নিষেধ মানে না তাহাদের উপরে দেশহিতের নামে প্রতিকূল আচরণ চলিতেছে, তখন সমস্ত বাংলাদেশ একটা বিষম উত্তেজনার স্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে 'কী হয় কী হয়' এই অভাবিতের বাঁকের দিকে প্রধাবিত। সেদিনকার উত্তেজনা আজকার দিনে কল্পনার দ্বারাও অনুভব করা বোধকরি সম্ভব নয়। সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। নিখিলেশ তাহার ধনী বন্ধু, লোকে তাহাকে মহারাজ বলে, সে পুরাতন অভিজাত বংশের সন্তান। কলেজে পড়ার সময়ে দু-জনের বন্ধুত্ব। তার পরে কর্মস্রোত দু-জনকে ভিন্ন দিকে লইয়া গিয়াছে।

সন্দীপ নামটা অন্বর্থ, কেননা সে নিজেও স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার বাগ্মিতার প্রভাবে অপরকেও উদ্দীপিত করিতে সমর্থ। নিখিলেশের স্বদেশপ্রেম বক্তৃতাধর্মী নয়, অকারণ উদ্দীপনাকে শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করে— তাহার ধারণা এই যে, যে-অগ্নি সংযত হইলে অন্ন প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাকে মশাল জ্বালাইয়া শোভাযাত্রায় নিয়োগ করা নির্বুদ্ধিতা। সে জানে যে, উত্তেজনার দ্বারা কোনো স্থায়ী ফললাভ হয় না, কোনো বড়ো কাজ হয় না। নিজের বিচার ও সামর্থ্য অনুসারে সে স্বদেশসেবা করিতে চেষ্টা করে— তাহার চেষ্টা প্রধানত সমবায়মূলক সংগঠনকার্যে নিবদ্ধ। তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারির প্রজাদের কল্যাণসাধনকার্যে সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বাহির হইতে উপকারের ভার তাহাদের উপর চাপাইয়া না দিয়া প্রজাদের আত্ম-বিশ্বাস জাগাইতে সে সচেষ্ট। তাহার স্বদেশপ্রেম ফল্গুধারায় প্রবাহিত, বাহিরে তাহার প্রকাশ স্বল্প। সে বলিতে পারিত মাটির নীচে যে-রস সর্বব্যাপী হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নাই বটে, কিন্তু তাহারই গোপন সঞ্চারে কি পৃথিবী শ্যামল হইয়া উঠে নাই ? এ-সব কথা সে বড়ো বলে না, আর বলিলেও বড়ো কেহ বিশ্বাস করিবে না, কারণ লোকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ চায়, উত্তেজনা চায়। লোকের বিশ্বাস, ধনী নিখিলেশ স্বদেশী আন্দোলনটারই বিরুদ্ধে, কেননা দেশ জাগিয়া উঠিলে ধনীর প্রভাব, বিশেষ ধনী জমিদারদের প্রভাব, ক্ষুণ্ন হইবার আশঙ্কা। অধিকাংশ লোকেই তাহাকে ভালোমানুষ মনে করে, অনেকেই তাহাকে কাপুরুষ ভাবে, কেহ-কেহ আসিয়া তাহাকে শুনাইয়া গিয়াছে যে, সে স্বদেশী-

দ্রোহী। সব দিক দিয়াই সন্দীপ তাহার বিপরীত। তাহার বিশ্বাস, হিমাচলের অচল তুষারস্তূপ বন্যারূপে দেশ ভাসাইয়া দিবার জন্যই সঞ্চিত হইয়া আছে। বাগ্মিতার দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি করাকেই সে স্বদেশসেবা মনে করে— সেই উত্তেজনা কোনো স্থায়ী কাজে লাগিল কিনা সে হিসাব তাহার দেখিবার নয়। উত্তেজনা যে উদ্দেশ্য মাত্র এ-কথা সে জানে কিনা জানি না, জানিলেও নিজের অনুচরদের কাছে প্রকাশ করে না, খুব সম্ভব সে-কথা এখন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। সে জোর করিয়া বিলাতি কাপড় বয়কট করে, বিলাতি লবণের বস্তা নদীতে ফেলিয়া দেয়। দেশের জন্য লুট করা, মিথ্যাকথন, জোর-জবরদস্তি করা, কিছুকেই সে অন্যায় মনে করে না, বরঞ্চ নিখিলেশ প্রশ্রয় দেয় না দেখিয়া তাহাকে স্বদেশ-ধর্মের বিধর্মী মনে করে। লোকে সন্দীপকে 'হীরো', বীরপুরুষ মনে করে। সন্দীপ নিজেও তাই মনে করে বলিয়া, স্বদেশের উদ্দেশ্যে যে-পুষ্পাঞ্জলিদান করে সে-সব যে নিজেরই পায়ের কাছে পড়িতেছে তাহা লক্ষ্য করে না, আর লক্ষ্য করিলেও বোধকরি আপত্তি করিত না।

নিখিলেশের পত্নী বিমলার চিত্ত বাগ্মিতার দ্বারা স্বদেশসেবার উদ্দীপনাময় মোহের দ্বারা সে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষণটা কেবল ভাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহা যে নীতিবিরুদ্ধ, সন্দীপ তাহা জানে বটে, কিন্তু জানিলে কী হয়, নীতিকেই যে সে মানে না। তাহার বিশ্বাস, ভীরুপ্রকৃতির লোকের জন্যই নীতির অনুশাসন। ধর্মভীরুতাকে সে নিছক ভীরুতা বলিয়াই মনে করে। বিমলা ও সন্দীপের আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের আলোচ্য নয়, নীতির প্রতি সন্দীপের কী ধারণা সেই প্রসঙ্গে কথাটা বলিলাম। অবশেষে একদিন খবর আসিল যে, মুসলমানেরা সন্দীপকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তখন বীরপুরুষ সন্দীপ রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল। পলাইবার সময়েও সে নিজেকে ভীরু মনে করে নাই. দেশের হিতের জন্যই সে জীবনটাকে লইয়া অন্যত্র চলিল। দেশের হিতের জন্যই অনেক বীরপুরুষ জীবনটাকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখে। এদিকে সন্দীপের দলের অমিতাচারে মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া হিন্দুর ঘরবাড়ি লুট করিতে, নারীনিগ্রহ করিতে শুরু করিয়াছে। খবর পাইবামাত্র নিখিলেশ ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইয়া গেল। যখন তাহাকে ফিরাইয়া আনা হইল, মাথায় বিষম চোট লাগিয়া সে অজ্ঞান। লোকে যাহাকে ভালো

মানুষ মনে করিত, সন্দীপ যাহাকে ভীরু ভাবিয়া অবজ্ঞা করিত, প্রয়োজনের সময়ে বিপদের মুখে যাত্রা করিতে সে দ্বিধা করে নাই— আর নিজের কৃতকার্যের দায়িত্ব ভীরু নিখিলেশের উপরে অনায়াসে চাপাইয়া দিয়া বীরপুরুষ সন্দীপ রাত্রির অন্ধকারে গোপনে পলায়ন করিল।

নিখিলেশ ও সন্দীপ দুই ভিন্ন মতের, পৃথক জাতের লোকের শ্রেণীরূপ। অন্য নামের অভাবে বলা যায় যে, এক দল সহিষ্ণুতার দ্বারা পলে পলে সাধনা করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়, অপর দল পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া যাহা-কিছু সম্মুখে পড়ে তাহাকেই ভাঙিতে চায়— এক দল গঠনধর্মী, এক দল ভাঙনধর্মী, এক দল প্রগতিশীল বিদ্রোহী বা **destructive revolutionary**, আর-এক দল রক্ষণশীল বিদ্রোহী বা **constructive revolutionary**— প্রগতিশীল বিদ্রোহীর শ্রেণীরূপ সন্দীপ, আর রক্ষণশীল বিদ্রোহীর শ্রেণীরূপ নিখিলেশ। সব সমাজেই এই দুই শ্রেণীর লোক আছে। কোনো সমাজে এক শ্রেণী বেশি, কোনো সমাজে-বা অপর শ্রেণী বেশি। আবার সমাজ-বিবর্তনের ফলে কখনো-কখনো শ্রেণীর তারতম্য ঘটে। বাঙালিসমাজের কথাই ধরা যাক। ডিরোজিয়োর সময় হইতে এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে একাধিকবার এইরূপ শ্রেণীবিপর্যয় ঘটিয়াছে। প্রধানত ডিরোজিয়োর এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভাঙনধর্মী লোকের সংখ্যা সমাজে বাড়িয়া গিয়াছিল। তারপরে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে গঠনধর্মীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধি বাধা পায় আসিয়া স্বদেশী আন্দোলনের মুখে, তার পর হইতে এখন পর্যন্ত ভাঙনধর্মীদের সংখ্যাই দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। একটা নেতিবুদ্ধি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বৈরবুদ্ধি, বাঙালি-সমাজে মারীর আকারে দেখা দিয়াছে।

ভাঙিতে বাঙালির বড়ো উল্লাস। বাঙালির সমস্ত আন্দোলনের মূলে নেতি-বাদের একটা প্ররোচনা ছিল— একসময়ে হয়তো প্রয়োজনের তাগিদে ছিল, ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে এবং অবশেষে অভ্যাস প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে উদাহরণ— স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি কায়মনোবাক্যে নামিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু মূলত বিষয়টা কী? ভাঙা বাংলাকে জোড়া লাগাইতে হইবে। ইহাকে যতই প্রোজ্জ্বল করিয়া দেখানো যাক, ইহা একটা নেগেটিভ প্রোগ্রাম মাত্র বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ— তখন বাঙালি তাঁহা

সঙ্গে ছিল। পরে সেই সুরেন্দ্রনাথ যখন গঠনমূলক কাজে বাঙালিকে ডাক দিলেন, একটি লোকও অগ্রসর হইল না, সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক একঘরে হইলেন। দেশবন্ধুর ডাকে বাঙালি তখনই সাড়া দিয়াছিল, যখন তিনি মন্ত্রিত্ব ভাঙিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু ইহাও একটা নেগেটিভ প্রোগ্রাম— গঠনমূলক কিছু নয়। সেই দেশবন্ধু যখন রেস্‌পন্‌সিভ কো-অপারেশনের কথা বলিলেন, বাঙালিসমাজে অসমর্থনের গুঞ্জন উঠিল। আরও পরবর্তীকালের ইতিহাস হইতে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে— কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন নাই। মোটের উপরে বলিলেই চলিবে যে, ভাঙনধর্মী লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, কি রাজনীতি, কি সমাজব্যবস্থা, কি শাসনব্যবস্থা এমনকি সাহিত্য-শিল্পের মতো বিবিক্ত ক্ষেত্রেও নেতিবুদ্ধি মারীর মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে বাঙালি সমষ্টিগত প্রয়াসে কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। ইদানীংকালে যাহা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এককের সৃষ্টি। সমবেত সৃষ্টির প্রয়াস সর্বত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যে-আগুনে অন্ন প্রস্তুত হইতে পারিত, সেই আগুনে মশাল জ্বালিয়া সমস্ত দেশটা সর্বনাশের শোভাযাত্রার পথে বহির্গত। অন্তরের সার্থকতা যতই ক্ষয় পাইতেছে, বাহিরের উদ্দীপনায় ততই বেশি করিয়া সে তৃপ্তি খুঁজিতেছে। কিন্তু মদ্যের কাছ হইতে কি খাদ্যের পুষ্টি পাওয়া সম্ভব ? বাংলাদেশে সন্দীপ আর একটিমাত্র নয়, সমস্ত বাংলাদেশ আজ সন্দীপের জনতায় পরিপূর্ণ। আর-এক দিকে নিখিলেশের দল সংখ্যায় ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।

বাংলাদেশের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা আমার উদ্দেশ্য নয়— তাহার জন্য বিস্তারিত ক্ষেত্রের আবশ্যক। যে-দুটি মনোভাব বাঙালিসমাজে সক্রিয় তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিতে চাই যে, নিখিলেশ ও সন্দীপ চরিত্রে তাহাদের সজ্ঞান প্রকাশ বর্তমান। স্বদেশী আন্দোলন কেন যে ব্যর্থ হইল, যে-আন্দোলন একটা দেশব্যাপী নবজাগরণ ঘটাইতে পারিত, কেন যে তাহা সংকীর্ণ রাজনৈতিক অগ্ন্যুদ্‌ভাসমাত্রে পর্যবসিত হইয়া নিজেকে ব্যর্থ করিয়া দিল— সে-আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র হইলেও সংক্ষেপে বলা যায় যে, সন্দীপী নেতিবুদ্ধি ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। আরও বলা যায় যে, সমাজে যতদিন এই নেতিবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন কাহারও মঙ্গল নাই। কেবলমাত্র সৃষ্টিধর্মী মনোবৃত্তির উন্মেষেই বাংলার বর্তমান দুর্গতির অবসান ঘটা সম্ভব।

শচীশ

'চতুরঙ্গে'র নায়ক শচীশের জীবনে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। জীবন না বলিয়া এখানে সাধনা বলিলেও চলিত, কেননা, শচীশের জীবনের যে-অংশটুকু লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাহার সাধনারই ইতিহাস।

প্রথম স্তরে দেখিতে পাই, শচীশ নাস্তিক জ্যাঠামশায়ের কর্মসঙ্গী। দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে, সে লীলানন্দ স্বামীর প্রধান শিষ্য। আর তৃতীয় স্তরে সে কাহারও সঙ্গী বা শিষ্য নয়, সে নিজেকেই নিজে চালিত করিতেছে, বাহিরের সাহায্যের উপর আর তাহার ভরসা নাই, সে এখন অনন্যশরণ ও আত্মদীপ।

প্রথম স্তরে শচীশের সঙ্গী জ্যাঠামশায়—পরে অবশ্য শ্রীবিলাসও আসিয়া জুটিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে আছেন স্বামী লীলানন্দ, আছে শ্রীবিলাস আর দামিনী নামে একটি মেয়ে। দ্বিতীয় স্তরেই প্রথম তাহার দেখা পাইলাম। তৃতীয় স্তরে শ্রীবিলাস ও দামিনী আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই—সাধক শচীশকে অনুসরণ করিয়া চলা সংসারী জীবের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শচীশের সাধনমার্গের 'ক্যাম্প-ফলোয়ার' শ্রীবিলাস ও দামিনী স্বভাবত সংসারী জীব, তাহারা তখন বিবাহ করিয়া আসিয়া সংসার পাতিয়া বসিল—শচীশকে একাই চলিতে হইয়াছে। এইখানেই শচীশের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। মরুভূমির পথিককে মরীচিকার প্রান্তে এক-আধবার যেমন চোখে পড়ে, শচীশকে পদ্মার চরে তেমনি এক-আধবার দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বোধকরি দেখিতে না পাইলেই ভালো ছিল। রৌদ্র-ভাস্বর বিরাট বৈরাগ্যের পটভূমিতে শচীশকে আর বদ্ধ জীব বলিয়া মনে হয় না। সে যেন আপনার পূর্বতন রূপের ছায়ামাত্র! জ্যাঠামশায়ের সঙ্গী ও লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য, উভয়েই সংসারী জীব; কিন্তু তৃতীয় স্তরের শচীশ নিতান্তই সংসারাতীত। এ এমনই নির্মম সত্য যে, শেষ পর্যন্ত অমিত-আশাচারিণী দামিনীকেও তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে—শচীশের পায়ের কাছে শেষ প্রণতি রাখিয়া দামিনী বিদায় লইয়াছে, বিদায় লইয়াছে তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা! দামিনী বুঝিতে পারিয়াছে যে, মরীচিকাকে লইয়া ঘর করা চলে না; বুঝিতে পারিয়াছে যে, মরীচিকা-নদীর কূলে শ্বেতপাথরের ঘাট বাঁধিলেও তৃষ্ণা নিবারণের উপায় হয় না। যাহাকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহাকে

গুরুরূপে বরণ করিয়া দামিনী ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রীবিলাসের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে— মুক্ত জীবকে মুক্তিপথে ছাড়িয়া দিয়া সংসারী জীব সংসারে প্রবেশ করিয়াছে।

শচীশের পরিণাম কী হইল আমরা জানি; তাহাতেই অনুমান করিতে পারি যে, সাধনার বাষ্পে ভরা উন্মার্গগামী বেলুনের মতো মহাশূন্যে সে উধাও হইয়া গিয়াছে।

২

সংক্ষেপে ইহাই শচীশের সাধনমার্গের ইতিবৃত্ত। স্বল্পপরিসর গ্রন্থের মধ্যে কী বিপুল পরিবর্তন! কোথা হইতে একেবারে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! কোথায় ডফ-সাহেবের ছাত্রের কর্মসঙ্গী, আর কোথায় আত্মদীপ, অনন্যশরণ মুক্তিসন্ধানী শচীশ! কোথায় ডফ-সাহেবের যুগ, আর কোথায় শচীশের পদ্মার চর! কোথায় কলিকাতা শহর, আর কোথায় অনির্দিষ্ট-ভূগোল দক্ষিণ সমুদ্রের নারিকেল-পল্লববীজিত নির্জন সৈকত, আর কোথায় বা সেই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মুখগহ্বরের মতো অন্ধকার গুহা! গভীর তমিস্রায় সেখানে ইতিহাসের পরপার হইতে সমীরিত দীর্ঘনিশ্বাস অনুভূত হয়, অজ্ঞাত দেহীর কোমল কেশরপুঞ্জ সুগভীর মিনতির মতো চরণদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া ধরে— এ যেন কায়ালোকের অতীত কোন্ ছম্‌ছম্‌ ছায়ার দুস্তর দ্বীপান্তর! কেবল দামিনীর বুকের মধ্যে বেদনাটি জ্বলিতে থাকে কবির গোপন কথাটির মতো!

চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে— না আছে ইহাতে গোরার অতিবিস্তার, না আছে ছোটোগল্পের অতিসংক্ষিপ্ত সংকীর্ণতা। নৌকাডুবির ভাবালুতা, শেষের কবিতার দীপ্তরশ্মির ছুরি-চালনা, 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোনে'র অর্ধমনস্ক খসড়া-প্রণয়ন— সব দোষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চতুরঙ্গ। উপন্যাসের স্বাধীনতা আর ছোটোগল্পের সীমাবদ্ধ দায়িত্বে মিলিত হইয়া চতুরঙ্গের অনবদ্য শিল্পকে সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের বিস্তারকে পাওয়া গিয়াছে অথচ কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য সদাজাগ্রত দৃষ্টির পাহারা রাখিতে হয় নাই; আবার ছোটোগল্পের মুক্তাসম মুহূর্তটিকে প্রতিবেশী গল্পের ধারার মধ্যে অনায়াসে নিমজ্জিত করিয়া দিবারও অবকাশ পাওয়া গিয়াছে. ইহা না উপন্যাস না ছোটো-

গল্পের সমষ্টি— চতুরঙ্গ খণ্ড-উপন্যাস বা অখণ্ড ছোটোগল্প। ঠিক এই শ্রেণীর, এ-আকৃতির রচনাই রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুকূল, রবীন্দ্র-কথাশিল্প-প্রতিভার যথার্থ বাহন। বাহনের আনুকূল্যে গল্পের ধারাটি অভীষ্ট পরিণামে পৌছিয়াছে, পাত্রপাত্রীর চরিত্রের দলগুলি বিকাশে বাধা পায় নাই— উপন্যাসের পাতা পূরণের জন্য মনস্তত্ত্বের বিরক্তিকর জাল-বুননও নাই, তেমনি আবার ছোটোগল্পের অতিসংহত গণ্ডি অতিক্রম করিবার নিরন্তর দ্বিধাও নাই— ফলে বাহন ও বাহিত অভিন্ন হইয়া অখণ্ড একটি শিল্পমূর্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই অখণ্ড শিল্পমূর্তির নাম দেওয়া যাইতে পারে শচীশের সাধনা।

চতুরঙ্গে এমন একটা গঠনগত সৌষম্য দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যাহা বিরল। দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব ও সমন্বয় এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, অথচ সুস্পষ্টতার খাতিরে সৌন্দর্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই, বরঞ্চ বিরুদ্ধমুখী ধাক্কার টাল সামলাইতে গিয়া সৌন্দর্য আপনার বীর্যের সন্ধান পাইয়াছে। এই বীর্যেরই নাম সৌষম্য। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাতেও সৌন্দর্যের অভাব নাই, কিন্তু সে যেন নারীর সৌন্দর্য ; চতুরঙ্গের সৌন্দর্য বীরের সৌন্দর্য— গ্রীক athlete-এর দেহে যে-বীরশ্রী পরিদৃষ্ট হয়, চতুরঙ্গের অঙ্গে তাহাই যেন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য এখানে গঠনগত সুষমার উপরে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে— দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব ও সমন্বয় আপন ভাবগত পূর্ণতাকে শিল্পগত সার্থকতায় পৌছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।

জ্যাঠামশায়ের প্রভাব শচীশ-চরিত্রের মৌলিক বেশ। 'পজিটিভিজম্' বা নিরীশ্বর কর্মযোগ জ্যাঠামশায় সম্বন্ধে সার্থক হইলেও শচীশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কেন হইল ? প্রথমত নিরীশ্বর কর্মযোগ বস্তুটাই খুব খাঁটি নয় —অর্থাৎ মানুষের স্বভাবের উপরে তার প্রতিষ্ঠা খুব দৃঢ় নয়। কাজেই এক-আধ জনের জীবনে তাহা ফলপ্রদ হইলেও সাধারণভাবে মানুষকে ফলদান করিতে তাহা অক্ষম। জ্যাঠামশায় লোকটা খাঁটি, কিন্তু শচীশের কর্মযোগ সম্বন্ধে সে-কথা বলা যায় না। এ-বস্তু গুরুমুখী বিদ্যার মতো পাইবার নয়, জীবন হইতে উদ্‌ভূত— আর শচীশের পক্ষে তাহা ধার-করা বস্তু। যতদিন উত্তমর্ণ জীবিত ছিল বেশ

চলিয়া যাইতেছিল— কিন্তু জগমোহনের মৃত্যুর পরেই সব কেমন ওলটপালট হইয়া গেল। নিরীশ্বর কর্মযোগী ভক্তিরস-সমুদ্রের ঠিক মাঝখানটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নিরীশ্বর ও অগুরু (জগমোহন কখনো গুরুর গৌরব দাবি করিত না) শচীশ প্রচণ্ড আস্তিক ও গুরুবাদী হইয়া উঠিল, তাহার কর্মযোগ ঘুচিয়া গিয়া নৈষ্কর্ম্যের লীলায় সে নাচিয়া-কুঁদিয়া পাড়া মাত করিতে লাগিল। দ্বন্দ্ব যত প্রবল, প্রতিদ্বন্দ্ব তত প্রচণ্ড হইল।

কিন্তু লীলাবাদেও তাহার স্থিতি হইল না, আবার তাহাকে পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিন্তু এবারে আর বাঁধা পথের নিশানা ধরিয়া নয়। নাস্তিক্য ও আস্তিক্য, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ, লঘুবাদ ও গুরুবাদ— সবই তাহার পক্ষে সমান অবাস্তব প্রমাণিত হইল। অনন্যোপায় হইয়া তবে সে অনন্যশরণ হইল; পরের প্রদীপে যখন আর চলিল না, নিজের দীপটি সন্ধান করিয়া জ্বালিয়া লইতে তখন সে বাধ্য হইল। এ-পথের পরিণাম লেখক দেখান নাই, কারণ সে-পরিণাম অনায়াসদৃশ্য নয়; তাহার লক্ষ্য মহৎ বলিয়াই তাহার অন্ত অনির্দিষ্ট। নিরীশ্বর কর্মযোগে ছিল নিছক অরূপের সন্ধান, ভক্তিযোগে ছিল প্রত্যক্ষরূপের সন্ধান। আর এখন? শচীশ এখন হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে, রূপেও নয় অরূপেও নয়, রূপারূপের সমন্বয়ের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান করিতে হইবে। তাহার মতে তিনি অরূপ হইতে রূপের দিকে নামিতেছেন, তাই সাধককে রূপ হইতে অরূপের দিকে উঠিতে হইবে, তবে তো মাঝপথে দু-জনের মিলন হইবার সম্ভাবনা! সেই সম্ভাবনার আয়োজনে শচীশ এখন মগ্ন— ইহাই তাহার বর্তমান সাধনার স্বরূপ। নিরীশ্বর কর্মবাদ ও গুরুবাদী ভক্তিযোগ যদি ত্রিকোণের দুটি কোণ হয় তবে তৃতীয় কোণটির নাম দেওয়া যাইতে পারে আত্মযোগ! রূপ ও অরূপ যদি ত্রিকোণের দুটি কোণ হয় তবে তৃতীয়টির নাম রূপারূপের সমন্বয়। এই দুরূহ পথের সীমানায় আনিয়া লেখক শচীশকে ঘরছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া করিয়া একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন। দামিনী ও শ্রীবিলাস তাহার সঙ্গচ্যুত হইয়াছে, আর যাহার মুখে শচীশের কথা জানিতে পাইতাম সেই শ্রীবিলাস সঙ্গছাড়া হওয়াতে আমরাও শচীশের সন্ধানভ্রষ্ট হইয়াছি— মরুভূমির পথিক মরীচিকার উপকূলে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

শচীশের সাধনার ধারা, বিশেষত প্রথম দুটি স্তরের, অনেকেরই জীবনে

অনুরূপভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে ; সে-হিসাবে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নাই— বিশিষ্ট শচীশ মানুষটি। অনায়াসলব্ধ সিদ্ধির দৃঢ় ভূমি হইতে সুগভীর অনিশ্চয়ের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে সে তিলমাত্র দ্বিধা করে নাই, সাধনবেগের উল্লাসে করায়ত্ত সিদ্ধিকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে, পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় ব্যয় করিয়া পুরাপুরি নিঃস্ব হইয়া সে পথে বাহির হইয়াছে। সে কেবলমাত্র পথিক নয়, একেবারে দেউল পথিক— ঘরের পথ যাহার চিরকালের জন্য রুদ্ধ। রবীন্দ্রজগতের নরনারীসমাজে শচীশ সত্যই অদ্বিতীয়, কেবল তাহার স্রষ্টার জীবনে অন্তহীন যে-সাধনবেগ অনুভব করা যায় তাহারই খানিকটা আপন বক্ষের মধ্যে লইয়া যেন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর-কাহারো সঙ্গে তাহার বড়ো মিল নাই।

বিপ্রদাস ও মধুসূদন

'যোগাযোগ' উপন্যাসখানির নাম রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'তিন পুরুষ' রাখিয়াছিলেন। পরে সে-নামটি পরিবর্তন করিয়াছেন। কাহিনীটি তিন পুরুষ অবধি গড়াইলে ঐ নামটি সার্থক হইত ; শুধু তাহাই নয়, পূর্ব নামের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাহিনীটি সম্পূর্ণ হইলে বইখানা রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইতে পারিত। বর্তমান আকারেও ইহাকে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা চলে। কিন্তু এখন আমরা কাহিনীটির শিল্পালোচনা করিতে বসি নাই, আমাদের উদ্দেশ্য অন্য ; যোগাযোগ নামটি হইতেই শুরু করা যাইতে পারে।

কবি 'তিন পুরুষ' নামের বদলে 'যোগাযোগ' নামটি কেন বাছিয়া লইলেন ? যোগাযোগ কাহাদের মধ্যে ? যোগাযোগ বলিতে দুই পক্ষ বোঝায়— এখানে সে দুই পক্ষ কাহারা ? কাহিনীটির প্রধান চরিত্র তিনটি— কুমুদিনী, বিপ্রদাস ও মধুসূদন। বিপ্রদাস ও মধুসূদন জোড়-বাঁধা চরিত্র ; এ-রকম জোড়-বাঁধা চরিত্র তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসেও আছে, এ-কথা পূর্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছি ! বিপ্রদাস ও মধুসূদন জোড়-বাঁধা হইলেও বিজোড়ের জোড়-বাঁধা। বিপ্রদাস পুরাতন ধ্বংসোন্মুখ

অভিজাত বংশের সন্তান; মধুসূদন নূতন অভ্যুদয়োন্মুখ ধনী, তাহার ধনের উপরে আভিজাত্যের ছাপ এখনো পড়ে নাই, তাহার ধন এখনো লক্ষ্মীর আসন হইয়া ওঠে নাই, এখনো তাহা কুবেরের বোঝা। অপর পক্ষে বিপ্রদাসের ঐশ্বর্যের উপর হইতে লক্ষ্মী অপসৃত হইলেও তাহার সর্বাঙ্গে এখনো তাঁহার শতদলের সুগন্ধ জড়াইয়া রহিয়াছে। পুরাতন ধনী ও নূতন ধনের মধ্যে যোগাযাগ ঘটিয়াছে উপন্যাসখানিতে, আর সে-যোগাযোগের কারণ কুমুদিনী। ঠিক এই কথাটি কবির মনে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু পাঠকের মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই দুই বিপরীতের যোগাযোগ কুমুদিনীর পক্ষে সুখের হয় নাই। কাহিনীর পাতায়-পাতায় নববধূর পায়ের যে-অলক্তকচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, হৃদয়ের রক্ত মিলিত না হইলে সে-সব কি এমন উজ্জ্বল, এমন হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিত? অসহায় কুমুদিনীর চিত্ত দুই মল্লের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, সেই ক্ষতির বিবরণ যোগাযোগ-কাহিনী।

যোগাযোগের বিরুদ্ধে অনেক পাঠক অভিযোগ তুলিয়া থাকেন যে, উপন্যাসখানির সূচনার উদার সমারোহ উপসংহারে অতৃপ্ত রহিয়া যায়। অপর কোনো বাংলা উপন্যাস এমন বিপুল আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। চৈত্রসন্ধ্যার পশ্চিমদিগন্ত মেঘমালার বিচিত্র ও উচ্চনীচ হর্ম্যমালায় যেমন ভরিয়া ওঠে, অস্তসূর্যের করুণ আভা তাহাদের উপরে পালিশ মাখাইয়া দিয়া তাহাদের যেমন উজ্জ্বল করিয়া তোলে; বকের পাঁতি যেমন তাহাদের দ্বারে বাতায়নে মালা দুলাইয়া দেয়, বিদ্যুতের চকিত শিখা যেমন কক্ষে-কক্ষে আলো জ্বালাইয়া বেড়ায়, সেই মেঘপুরীর ঈষন্মুক্ত গবাক্ষের ফাঁকে-ফাঁকে অতিকায় বীরপুরুষ ও অলৌকিক সুন্দরীগণের চঞ্চল চেহারা যেমন ক্ষণে-ক্ষণে চোখে পড়িতে থাকে, আর সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা চাপা গুরুগুরু রবে অন্তিম উৎসবের গম্ভীর উল্লাসে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দেয়— যোগাযোগ-কাহিনীর সূচনা অনেকটা সেই রকম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সে-সব কোথায় অন্তর্হিত! শূন্য দিগন্ত চমকিত করিয়া একটি অগ্নিময় শূল ভূগর্ভে আমূল নিহিত হয়— বিপুল সমারোহের কোথাও চিহ্নমাত্র থাকে না! কুমুদিনীর হৃদয়বেদনা সেই অগ্নিময় শূল, শেষ পর্যন্ত কেবল তাহাই দৃশ্যমান, সূচনার ঐশ্বর্য কোথায় বিলীন হইয়া যায়। যোগাযোগের বিরুদ্ধে এই যে আশাভঙ্গের অভিযোগ, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে বস্তুসত্য থাকিলেও

তজ্জন্য কবিকে দোষী করা চলে না। প্রথমত, তিন পুরুষের ইতিহাসকে তিনটি কাহিনীতে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। তিন পুরুষের কাহিনী লিখিতে গেলে বনিয়াদ দৃঢ় ও প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হয়। বনিয়াদের আড়ম্বরের সহিত অসমাপ্ত সংকল্পের বিশালতাকে মিলাইয়া লইয়া বিচার করিতে হইবে। সে-বিচারে কবি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার উদ্দেশ্যটাও মনে রাখা আবশ্যক। প্রাচীন বংশের কাহিনী লিখিতে তিনি বসেন নাই— তিনি প্রাচীন বংশের একটি কন্যার কাহিনী লিখিতে উদ্যত। ঐটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; প্রাচীন বংশের কন্যাটি নূতন ধনীর ঘরে আসিলে যে-যোগাযোগ স্থাপিত হয়, পুরাতন সংস্কারের সহিত নূতন পরিবেশের যে-দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া ওঠে, তাহাই লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রাচীন ও নবীনের পটভূমি যেখানে গায়ে-গায়ে লাগিয়াছে কুমুদিনীর হৃদয় সেখানে বিন্যস্ত। মেঘমালার পটের উপরে যে-বিদ্যুৎশিখা উদ্‌ভাসিত তাহারই অগ্নিজ্বালা লিখিতে কবি ব্যস্ত। কুমুদিনীই শিল্পীর লক্ষ্য। বিপ্রদাসের ও মধুসূদনের প্রাধান্য ও প্রসার যত বেশি হোক-না কেন, কুমুদিনীর অন্তর্জ্বালার পটভূমির চেয়ে তাহারা গুরুতর নয়। আর সেইভাবেই তাহাদের বিচার করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসের একটা শিল্পেতর গুরুত্ব আছে, তাহারা সামাজিক ইতিহাসের দলিলও বটে। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' আর 'যোগাযোগ' প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

অভিজাত ধনীবংশের ক্রমিক অবনতি অতিশয় করুণ দৃশ্য। কারণ, ধন গেলেও ধনের অভিমান যাইতে চাহে না, লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার শূন্য আসনটা আঁকড়িয়া থাকিবার যেন একটা প্রবণতা দেখা যায়। তেমনি আবার আর-এক দিকে নূতন ধনের স্তূপীকৃত অহংকারের উপরে লক্ষ্মীর চরণ পড়িবার আগেই শ্রীমন্ত হইয়া উঠিবার বিসদৃশ প্রয়াস হাস্যকর। পুরাতন ধনী নূতন ধনকে অবজ্ঞা করে, নূতন ধনী ক্ষীয়মাণ অভিজাতবংশকে মনে-মনে ঈর্ষা করিয়া বাহিরে নতশির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এই দ্বন্দ্বে যে মানব-রস নিহিত তাহা সাহিত্যের সামগ্রী সন্দেহ নাই। এই সামগ্রীই যোগাযোগে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের পুরাতন জমিদারবংশের ঐশ্বর্যের চন্দ্রকলা ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, নূতন স্বর্ণস্তূপের প্রোজ্জ্বল সূর্যমণ্ডল লোকচক্ষু ঝলসিয়া দিয়া উদিত হইতেছে—

পুরাতন বংশের নাশ ও অভ্যুদয় রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি নিজেও পুরাতন অভিজাতবংশের সন্তান। তাঁহার দীর্ঘ জীবনকালে এ-দেশে যে-সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তন্মধ্যে পুরাতন ও নূতন বংশের সৌভাগ্য-বিবর্তন একটি প্রধান ব্যাপার। বাংলাদেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ইতিহাসের প্রকৃতি অনেক পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। নবাবি শাসনের উপসংহার-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গত শতকের শেষাংশ পর্যন্ত এই পরিবর্তনের বিরাট স্রোত বাংলাদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। এখন দুইটি ধারাই মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, এখন আমরা দুইটি ধারাকেই সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি— আর সেইজন্যই এই পরিবর্তন তেমন করিয়া আর আমাদের মনকে নাড়া দেয় না। কিন্তু পরিবর্তনের প্রারম্ভে অভিজাতের তিরোভাব আর সদ্যোজাতের প্রাদুর্ভাবকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইত, কাজেই মন বিশেষভাবে ধাক্কা খাইত।

পুরাতন বংশের ধন অভ্যস্ত, সে-পরিবেশে বিপ্রদাস সম্ভব। নূতন অনভ্যস্ত ধনে মধুসূদন ছাড়া কী সৃষ্টি করিতে পারে? অবিনাশ ঘোষালে ধন অনেক পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, নতুবা সে এমন বিশ্রদ্ধভাবে নিজের জন্মদিনের উৎসবকে স্বীকার করিতে পারিত না। মধুসূদন কখনো নিজের জন্মদিন পালন করে নাই, কিন্তু খুব সম্ভব সে তাহার ব্যবসায়ের জন্মদিন পালন করিত। তিন পুরুষ অবধি কাহিনীটা গড়াইলে অবিনাশের পুত্রকে নূতন পরিবেশের বিপ্রদাস-রূপে দেখিতে পাইতাম। কারণ, তখন ধন তাহার কেবল অভ্যস্ত হয় নাই, রীতিমতো পরিপাক হইয়া গিয়াছে। অবিনাশের জন্মদিন-পালনে যে-সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়, অবিনাশের পুত্রে তাহাও লোপ পাইত। তিন পুরুষের কমে ধন মজ্জাগত হইয়া উঠিতে পারে না, খুব সম্ভব সে-প্রক্রিয়াটা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি তিন পুরুষ -কালের ইতিহাস লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

অভিজাতবংশের বিপুল ঔদার্য যেমন মনকে মুগ্ধ করে, নূতন ধনোপার্জন-চেষ্টার পৌরুষও তেমনি মনকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ঔদার্যে যেমন সৌন্দর্য আছে, পৌরুষের মধ্যেও তেমনি সত্য আছে; পৌরুষ বা শক্তি অভ্যস্ত না হওয়া অবধি পেশীতে-পেশীতে স্ফীত হইয়া ওঠে, কিন্তু শক্তি যখন আত্মস্থ হয় তখন তাহার মতো সুন্দর আর কী? বিপ্রদাসকে দেখিয়া মোতির মার মনে

হইয়াছিল যে, এই শান্ত সমাহিত পৌরুষ-গম্ভীর বীরমূর্তি রামায়ণ-মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। মধুসূদনকে দেখিলে কী মনে হইবে? কেরোসিনের গুদাম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না। কিন্তু এ দুইয়ে প্রভেদ কতখানি? প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের বিস্মৃত আদিযুগেই যে গুদামঘরের ছায়া দেখিতে যাওয়া যায়। বিপ্রদাস, মধুসূদন ও অবিনাশে ধনের ত্রিমূর্তি। ধনের জরা বিপ্রদাস, ধনের পৌরুষ মধুসূদন, আর অবিনাশে— যাহার ধমনীতে বিপ্রদাসের বংশের আর মধুসূদনের দুয়েরই রক্ত প্রবাহিত তাহার মধ্যে —নূতন করিয়া ধনের নবজন্মলাভ। অবিনাশ আভিজাত্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা চাটুজ্জেদের প্রাচীন আভিজাত্য নয়, তাহার মধ্যে ধনের পৌরুষ আছে বটে কিন্তু তাহা কেরোসিনের গুদামঘর হইতে উদ্‌ভূত নয়। পুরাতন উদারতা নূতন পৌরুষ, পুরাতন আভিজাত্য ও নূতন পরিবেশ মিলাইয়া লইয়া অবিনাশ গঠিত; বিপ্রদাস তাহার মাতুল, মধুসূদন তাহার পিতা, কুমুদিনীর অন্তর্জ্বালা-বিদীর্ণ গর্ভ হইতে হইতে তাহার প্রকাশ।

বিপ্রদাস- ও মধুসূদন-চরিত্র বুঝিবার সময়ে এই কথাগুলি মনে রাখিলে কাজ সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

অভীককুমার

আচারনিষ্ঠ হিন্দুপরিবারের সন্তান অভীককুমার। তাহার পিতৃদত্ত নাম অভয়াচরণ। অভীককুমার নামটি তার স্বোপার্জিত। সে নিজেকে বলে নাস্তিক, কোনো-কিছুকে সে মানে না, কোনো-কিছুকে সে ভয় করে না, অভীককুমার নাম তার সেই মনোভাবের প্রতীক। কিছু না মানিবার ঝোঁকে সে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছে— এমনকি যে-ধরনের ছবি সে আঁকে, তাতেও আছে শিল্প-সংস্কারকে লঙ্ঘন করিবার ঝোঁক। তার ছবির সমঝদারি যারা করে তারাও কিছু মানে না বলিয়া তাদের বিশ্বাস। অভীককুমারের ধারণা, তারা না মানে কিছু, না জানে কিছু। তাহাদের সমঝদারিতে তাহাকে খুশি করিতে পারে না।

পশ্চিমের বড়ো হাট হইতে খ্যাতি কিনিবার দুরাশায় জাহাজের খালাসি হইয়া সে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছে।

তার না-মানাকে তার পিতা অনেকদূর সহ্য করিয়াছিলেন, অবশেষে বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। অভীককুমারের মাতা গৃহত্যাগের সময়ে তাহাকে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন ; অভীককুমার বলিয়াছিল —টাকা সে তখনই লইতে পারিবে যখন সে উপার্জন করিতে শিখিবে। কিন্তু ছবি আঁকিয়া উপার্জন করিবার আশা তার নাই— সে শিল্পের কালাপাহাড়। কোনো বন্ধন যার নাই সে-ও মাধ্যাকর্ষণের অতীত নয়— সহপাঠিনী বিভার প্রতি তার একটা গূঢ় আকর্ষণ আছে।

অভীককুমারের জন্মগত বংশপরিচয় যাই হোক-না কেন, তার মনোগত বংশপরিচয় স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি পুরুষের সহিত তাহার মনঃসাম্য বর্তমান। তাহার চেহারা, তাহার আচরণ, তাহার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, তাহার বাক্‌নৈপুণ্য স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাহার রক্তে আছে শচীশ, গোরা আর অমিত রায়ের রক্তের ছোঁয়াচ।

শচীশের পিতা ও জ্যাঠামশায় ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের মানুষ। এখানেও দেখি, অভীককুমারের বংশেও তেমনি দুটি স্বতন্ত্র জাতের মানুষের অস্তিত্ব বর্তমান। তাহার পিতা অম্বিকাচরণ শচীশের পিতার মতোই সংস্কার-বদ্ধ ব্যক্তি ; আর তার জ্যাঠামশায় বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন— ঈশ্বর-না-মানা পণ্ডিত— ছিলেন শচীশের জ্যাঠামশায়ের অনুরূপ। আর অভয়াচরণে ছিল শচীশের সংস্কার-না-মানা নিষ্ঠা।

অভীককুমারের চেহারার বর্ণনা পড়িলে বোঝা যাইবে, কীরকম মিশ্রধাতুতে সে গঠিত।

'অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁচের। আঁট লম্বা দেহ, গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে, তারা একে শত হস্ত দূরে বর্জনীয় বলে গণ্য করত।'

এই বর্ণনার মধ্যে শচীশ, গোরা আর অমিত রায়— তিনজনেরই আভাস লুকানো। যে-উপাদানে রবীন্দ্রনাথ ইহাদের তিনজনকে গড়িয়াছিলেন তারই

খানিকটা যেন অবশিষ্ট ছিল তাঁর শিল্পীমনের কোণে— তারই সাহায্যে পূর্বোক্ত তিনজনের চতুর্থরূপে অভীককুমার গঠিত। তাহারা চারজনে ভাগ্যের পাশাখেলায় বসিয়াছে— নাস্তিক্যের পুরস্কার তাহাদের সম্মুখে দোদুল্যমান। গোরা নাস্তিক্যের আস্তিক ; সে কিছু মানিতে চায়, কিন্তু কী মানিবে জানে না। শচীশ আস্তিক্যের নাস্তিক, তাহার জ্যাঠামশায়ের মতো সে না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত। অমিত উত্তম পুরুষের নাস্তিক ; সে আপনাকে অবধি বিশ্বাস করে না, বনেদি নাস্তিককে সে ডিঙাইয়া গিয়াছে— বনেদি নাস্তিক আর-যাহাকেই অবিশ্বাস করুক, নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না। আর অভীককুমার নাস্তিক্যের ধূমকেতু ; তার দিক নাই দেশ নাই, তার উদ্দেশ্য নাই লক্ষ্য নাই— কেবল আছে 'বী মধুকরী'-রূপী একটা ধ্রুবতারা— কিন্তু সে এত দূরে যে তাহার আকর্ষণের টান পৌঁছায় না ধূমকেতুর জগতে।

মনীষা নামে একটি মেয়ে অভীককে ভালোবাসিত। তাহার মৃত্যুর পরেই তাহার প্রদত্ত উপহারের ঘড়িটা সে বেচিতে আসিয়াছে বিভার কাছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠিবে— বিভাকে তবে কি সে ভালোবাসে না? বলা মুশকিল। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, বিভার প্রতি সে এক-রকম আকর্ষণ অনুভব করে— তবে সে-আকর্ষণ ভালোবাসার, না ভালোবাসার অহংকারজাত— বলা কঠিন। বিভা ধরা দেয় নাই বলিয়াই আকর্ষণ, ধরা দিলে কী হইত কে জানে ? কিংবা আকর্ষণের আসল কারণ বিভার ঈশ্বর-না-মানা মনকে পরাস্ত করিবার আশা। অভীককুমার তাহার পত্রে বলিয়াছে বটে যে, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া চোখ বুজিয়া নিজেকে সমর্পণ করিবে বিভার হাতে। কিন্তু প্রণয়ের সব কথা কি সমান বিশ্বাসযোগ্য ? চতুর সেনাপতি হটিয়া আসিয়া পালটা আক্রমণ করে, তার হটিয়া আসা পরবর্তী জয়েরই যে ভূমিকা। অভীকের উক্তিকে কি সেভাবে নেওয়া যায় না ?

আগে বলিয়াছি বটে যে অভীক শচীশ - অমিত রায় প্রভৃতির সমোপাদানে গড়া। কথাটা মিথ্যা নয়, আবার সম্পূর্ণ সত্যও নয়। উপাদান একই বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ঘরের কোণে পড়িয়া থাকাতে তাহাতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কালের পরিবর্তন উপাদানে বর্তাইয়াছে।

নদীর জলের গভীরতা মাপিবার উদ্দেশ্যে স্থানে-স্থানে নিশানা পোঁতা হয়।

সমাজস্রোতের গতি- ও গভীরতা-মাপক হিসাবে কোনো-কোনো রচনাকে লওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে এভাবে দেখা যাইতে পারে। তাঁর রচিত উপন্যাস-গুলির ধারা অনুসরণ করিলে আমাদের সমাজবিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যাইবে। চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, বাঁশরি, দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায় ও তিন সঙ্গী—একাধারে সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং সামাজিক ইতিহাসের দলিল। চোখের বালির সঙ্গে মালঞ্চের প্রভেদ, গোরার সঙ্গে শেষের কবিতার প্রভেদ, ঘরে-বাইরের সঙ্গে চার অধ্যায়ের প্রভেদ আলোচনা করিলে অল্পকালের মধ্যে আমাদের সমাজে কী গভীর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে। আবার, বাঁশরি সরকার আর কুমুদিনী কি একই সমাজের লোক, নৌকাডুবি ও তিন সঙ্গীর গল্পগুলি কি একই লেখকের লেখা? তিন সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রোথিত সমাজস্রোত-মাপক শেষ নিশানা। এটি কেবল রবীন্দ্রনাথের হাতে পোঁতা শেষ নিশানা মাত্র নয়, সমাজস্রোতেরও শেষ নিশানা—আর-কোনো লেখকের পাইলট নৌকা এখনো এই সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই। অতিবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অতিতরুণও বটেন, সনাতনের বার্তাবাহী আধুনিকতার চূড়ান্ত, চিরন্তনের সংবাদ জানিলে তবেই অদ্যতনের দিশারি হওয়া সম্ভব।

শেষের কবিতা লিখিত হইবার পরেও সমাজের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কবিজীবনেরও বটে। কবির জীবনের কথাই ধরা যাক—অমিত রায়ের উপহাসের বিষয় ছিল রবি ঠাকুরের কবিতা, 'রবিবার' গল্পের উপহাসের বিষয় অভীককুমারের নূতন ধরনের ছবি। সেটা বেনামে রবীন্দ্রনাথেরই ছবি বটে। ইতিমধ্যে কবিশিল্পী চিত্রীশিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ছবির ধর্ম অনেক পরিমাণে পরবর্তী রচনায় সংক্রমিত হইয়া গিয়াছে। তাঁর শেষের রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর ছবির মিল বেশি, তারা যেন একই গুহামুখ হইতে নিঃসৃত। অভীককুমারের ছবিগুলি কেবল স্বতন্ত্র ধরনের নয়, সে নিজেও সমাজের আর-পাঁচজন হইতে আলাদা জাতের লোক। তার মধ্যে যে-দুর্দম সমাজ-ছাড়া শক্তি আছে তাহার প্রকৃষ্ট তুলনা-স্থান রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত দুর্ধর্ষ রেখার চিত্রগুলি। উদ্ধত বর্শাফলায় অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের দান্তে-বেয়াত্রিচে ছবির প্রণয়ীযুগলের মতো অভীককুমার ও বিভা, 'শেষ কথা'য় নবীনমাধব ও অচিরা, বিরহের অসিপত্রব্যবধানে

মুখামুখি হইয়া দণ্ডায়মান, সংকোচের শেষ ব্যবধানটুকু আর তাহাদের কিছুতেই ঘুচিল না, কামনার যজ্ঞানলে মিলনের হবি-বিন্দুটি সদ্যঃপাতিতার মুখেই রহিয়া গেল। কেবল যে-রেখার উপাদানে তাহাদের শরীর গঠিত তাহাদের তড়িৎ-শিখাতীব্র বন্যাশ্ব-চঞ্চল দুর্দম চঞ্চলতায় বুঝিতে পারা যায়, কী অধীর অসামাজিক আগ্রহের আসক্তি শীতান্তে জাগ্রত ভুজঙ্গচয়ের মতো রক্তে তাহাদের সর্পিল হইয়া ফিরিতেছে! তবু শেষ ব্যবধান ঘোচে না! চোখের বালিতেও শেষ ব্যবধান ঘোচে নাই, ঘরে-বাইরেতেও নয়— কিন্তু সেখানকার বাধা সামাজিক— তিন সঙ্গীর গল্পগুলির বাধা কোথায়? বাধা যেখানেই হোক, আলোচনা আবশ্যক সামাজিক দলিল হিসাবে এবং কবির মানসিক দলিল হিসাবে। ল্যাবরেটরি গল্পটিতে এ-দুটি ধারার চরম।

সোহিনী

সোহিনীর মতো নারী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। অনেকে বলিবেন, সে তো বাঙালি মেয়ে নয়। কিন্তু সে যে বাঙালির মানসকন্যা তাতে আর সন্দেহ কী। বাঙালি লেখকের মানসকন্যা হিসাবেই সোহিনীর বিচার করিতে হইবে, তার ফলে সোহিনীর ও সোহিনীর সৃষ্টিকর্তার— দু-জনেরই পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা।

নন্দকিশোর লণ্ডনের পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার, তার উপরে সে প্রতিভাবান ব্যক্তি। এ-দুয়ের সমন্বয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রচুর টাকা উপার্জন করিয়া ফেলিয়াছিল। সে-টাকা 'জপতপের টাকা' নয়— নন্দকিশোরের টাকা সাধুপন্থায় তার পকেটে আসে নাই। কিন্তু তাহাতে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। তার বিশ্বাস এই যে, সাধু উদ্দেশ্য অসাধু টাকাকে সংশোধন করে। তার উদ্দেশ্যে ছিল যে, দেশে বিজ্ঞানসাধনার রাজপথটা খুলিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্যে সে একটি বৃহৎ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই ঘটনার মুখে সোহিনীর সঙ্গে তার পরিচয়। নন্দকিশোরের টাকার মতোই সোহিনীর গায়েও অসাধ্বীতার ছাপ ছিল। কিন্তু তেমনি আবার দুয়ের মধ্যেই ছিল খাঁটি বস্তু। নন্দকিশোর ও সোহিনী প্রথম

দর্শনেই পরস্পরকে চিনিল। নন্দকিশোর সোহিনীকে বিবাহ করিয়া একই সঙ্গে তাহাকে সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী করিয়া লইল। সে বুঝিয়াছিল যে, মেয়েটি তাহার দুরূহ বিজ্ঞানসাধনার উত্তরসাধিকা হইবার যোগ্যা। সোহিনীর কন্যা নীলিমা।[১]

ল্যাবরেটরি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবার আগেই নন্দকিশোরের মৃত্যু ঘটিল। সে রাখিয়া গেল প্রচুর টাকা ও ল্যাবরেটরির অসমাপ্ত কাজ। সোহিনী সেই অসমাপ্ত সূত্র তুলিয়া লইল। কিন্তু শুধু যন্ত্রে তো কাজ হয় না, উপযুক্ত যন্ত্রী চাই। যন্ত্রী জোগাড়ের উদ্দেশ্যে সে তৎপর হইল। ইহাই তাহার সতীকর্ম হইয়া উঠিল। সতীধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনে কোনো মোহ ছিল না। বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহোত্তর জীবন তাহার নিষ্কলুষ নয়। এ-সব কথা নন্দকিশোর জানিত, সোহিনীও নিজ-মুখে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। কিন্তু এক জায়গায় সে খাঁটি ছিল, নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি ও বিজ্ঞানসাধনার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তাহার মনে পাতিব্রত্যের অভাব ছিল না। এইজন্যই তাহার পাতিব্রত্যকে সতীধর্ম না বলিয়া সতীকর্ম বলিয়াছি। পতির কর্মে সে সতীর চরম। সে যতটা সহধর্মিণী তার চেয়ে অনেক বেশী সধর্মিণী। তাহার সতীত্বকে 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' সতীত্ব বলা যাইতে পারে। সাধারণ সতীধর্ম কায়মনোবাক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সোহিনীর সতীত্বের একমাত্র প্রতিষ্ঠা তাহার বুদ্ধি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি। সাধারণ মাপকাঠিতে সে নিশ্চয়ই সতী নয়— কিন্তু একটা অসাধারণ মাপকাঠিও যে থাকিতে পারে,

১ একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। 'তিন সঙ্গী' বইখানির তিনটি গল্পেরই প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞানসাধনা, প্রধান ব্যক্তিরা সবাই বৈজ্ঞানিক। এমনকি আর্টিস্ট অভীককুমারকেও বৈজ্ঞানিক বলিতে বাধা নাই। এঞ্জিনিয়ারিং-এ তাহার আসক্তির জন্য এ-কথা বলিতেছি না; জীবনের প্রতি তাহার নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষাহীন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি— তাহাকে শিল্পের বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে। 'শেষ কথা' গল্পের নবীনমাধব ও অধ্যাপক দু-জনেই বৈজ্ঞানিক। ল্যাবরেটরি গল্পটার আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিকতায় পূর্ণ। সোহিনী নিজে বৈজ্ঞানিক না হইয়াও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দীপটার চারি দিকে মুগ্ধ মক্ষিকার মতো ঘুরিয়া মরিয়াছে। 'তিন সঙ্গী'তে বৈজ্ঞানিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণের কারণ কী? ১৩৪৪ সালে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিন সঙ্গীর গল্পগুলি ১৩৪৬ সাল হইতে ১৩৪৭ সালের মধ্যে লিখিত। বিশ্বপরিচয় লেখা শেষ হইয়া গেলেও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াটা কবির মনে সক্রিয় ছিল, তাহারই রূপান্তর কি তিন সঙ্গীর গল্পগুলি? বিশ্বপরিচয়ে যাহা নির্গুণ, তিন সঙ্গীতে তা-ই যেন মনের কার্ব ও নামধাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত। তিন সঙ্গীর বৈজ্ঞানিকতার ইহা একটা কারণ মনে হয়। অন্য কারণ থাকাও বিচিত্র নয়, অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধানের ফলে কবির মনের ও প্রতিভার বিবর্তনের নূতন দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

সোহিনীর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই গোড়াতে বলিয়াছিলাম, সোহিনীর মতো নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

দুর্লভ, কিন্তু একেবারে নাই এমন নয়। সোহিনীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দুর্দমনীয় ভোগস্পৃহা, প্রখর বুদ্ধির ধার অনেক পরিমাণে দেবযানীর চরিত্রে প্রাপ্য। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব বেশি নয়। পৌরাণিক কাহিনীর কাঠামোর দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ; কালান্তরে দেবযানী সোহিনী হইয়া উঠিতে পারিত, এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায়। তার বেশি কিছু বলিবার নাই। বিনোদিনীতেও সোহিনী-চরিত্রের আদরা পাওয়া যায়— কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের ও ভিন্ন কালের মেয়ে। সোহিনী-চরিত্রের অনুরূপ মিলিবে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের রচনায়। বাঁশরি সরকার, ঊর্মিমালা, নীলিমা— সোহিনীর উপাদানে, সোহিনীর প্রক্রিয়ায় গড়া; কিন্তু এই ধারার একেবারে চূড়ান্ত সোহিনী; কেবল এই ধারাটার চূড়ান্ত মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নরনারীর শেষতম প্রান্তে অধিষ্ঠিত সোহিনী। আপন সৃষ্টি-শিখরের চূড়াস্তে সোহিনীরূপ আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দিব্য লেখনীর লীলা সংবরণ করিয়াছেন। সোহিনী অস্তগমনোন্মুখ রবির শেষকীর্তি হইয়াও মধ্যাহ্নজ্বালায় ভাস্বর, সায়াহ্নের গৈরিক তাহাকে এতটুকুও কোমল করিতে পারে নাই। কেন এমন হইল, সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সোহিনীর স্রষ্টার একটা গূঢ় পরিচয় পাওয়া যাইবে মনে হয়। সায়াহ্নের সূর্যকিরণে মধ্যাহ্নের অপ্রত্যাশিত অন্তর্জ্বালা আসিল মানব-মনোরহস্যের কোন্ সূত্রপথে? জীবনের অপরিশোধিত কোন্ ঋণ সায়াহ্নের গৈরিক ঝুলি মধ্যাহ্নের স্বর্ণমুদ্রায় এমনভাবে নিঃশেষে শোধ করিয়া দিল? এ-রহস্যের অনুসন্ধান আবশ্যক।

২

কবির রহস্যলোক-অবরোহণের তিনটি ধাপ বর্তমান— গদ্যকবিতা, চিত্র ও শেষবয়সে লিখিত কয়েকটি গল্প; সবগুলিই তাঁহার শেষবয়সের কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই যে, প্রথমবয়সের রচনাগুলি পর্বে-পর্বে, ধাপে-ধাপে উন্নীত হইয়াছে, আর শেষবয়সের রচনাগুলি, তন্মধ্যে চিত্রও অন্যতম, মনোরহস্যের রসাতলে অবরোহণমুখী। প্রথমবয়সের রচনা উচ্চেতনমুখী। উচ্চেতন বলিতে বুঝি ব্যক্তিগত চৈতন্যের ঊর্ধ্বে যে-বিশ্বব্যাপী চৈতন্যলোক আছে

তাহাই, ইহাকে বলিতে পারি বিশ্বচৈতন্য। আর অবচেতনা থাকে ব্যক্তিগত মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে, জ্ঞানের সাধারণ আলোক সেখানে প্রবেশ করে না বলিয়া সেই রহস্যলোক সাধারণত অজ্ঞাত রহিয়া যায়। বিশ্বচৈতন্যে উন্নীত হইতে যেমন অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অবচেতনার গহ্বরে নামিতেও তেমনি অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অননুপ্রেরিতের পক্ষে দুই-ই দুষ্প্রবেশ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দুই জাতীয় অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনে কার্যকর হইয়াছে— উচ্চেতনমুখী প্রথম দিকে, আর অবচেতনমুখী শেষ দিকে। শেষোক্ত অনুপ্রেরণার ইতিহাস বর্তমান তাঁহার গদ্যকবিতায়, চিত্রাবলিতে এবং 'তিন সঙ্গী' -জাতীয় গল্পে।

তবে সবগুলিতেই অনুপ্রেরণার তেজ সমান প্রবল নহে, গদ্যকবিতায় অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহার দ্বিধা যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই ; চিত্রে, ল্যাবরেটরি গল্পে প্রবল— তখন সে নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল ত্রিকালদর্শী নহেন, ত্রিলোকদর্শীও বটেন। চেতন, উচ্চেতন ও অবচেতন— তিন লোকেরই সংবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গদ্যকবিতায় যে-জাতীয় বিষয়বস্তু তিনি অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে তাহা নাই, এমনকি ছোটোগল্পেও বিরল। অভিজ্ঞতার নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের উদ্দেশ্যেই কবিতার গদ্যময় রূপটি তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। 'কিনু গোয়ালার গলি' নামে পরিচিত কবিতাটিতে রবীন্দ্র-রচনার সহিত তাঁহার একটা আন্তরিক অমিল আছে। তাঁহার পরিচিত সংসারের একান্তে দুর্ভাগ্যের যে-আস্তাকুঁড় বর্তমান, সেখানে তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন— অবচেতন-লোকে নামিবার গুহাদ্বারটা যে ঐ আস্তাকুঁড়ের নিকটেই। কিন্তু পূর্বতন সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিবার ফলে সেখানে একবারমাত্র পা-ফেলিয়াই তিনি আবার উচ্চেতনলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই কবিতাটির সমাপ্তি তাহার সূত্রপাতকে সমর্থন করে না। এটা যেন উচ্চেতন ও অবচেতন লোকের সীমান্ত।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলি অবচেতনলোকের বার্তাবাহী। ছবিগুলির কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনা করিলেও খুব সম্ভব একটা ক্রমবিকাশের চিহ্ন পাওয়া যাইবে— কিন্তু মোটের উপরে ইহাদের অবচেতন বার্তাবাহিতা

নিঃসংশয়। রবীন্দ্রচিত্রে নরনারীর স্বাভাবিক রূপ বিরল, যাহা আছে তাহাও যেন গুপ্ত অভিজ্ঞতার আলোতে বিকৃত। স্বাভাবিক গাছপালার চিত্র অল্প হইলেও মানবমূর্তির চেয়ে সংখ্যায় বেশি। সংখ্যাগৌরবে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের রূপ সুপ্রচুর। কিন্তু বোধকরি সংখ্যায় সবচেয়ে অধিক এমন-সব জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদ— যাহাদের অনুরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাহারা কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়— তাহারা নিছক রূপ। শিল্পবিচারে imitation theory বলিয়া একটা পথ আছে, 'ইমিটেশন' বস্তুসাপেক্ষ, তাহা বস্তু-আশ্রয়ী সত্য। কিন্তু এই ছবিগুলির মূলে কোনো বস্তুভিত্তি না থাকায়, ইহা কোনো-কিছুর 'ইমিটেশন'-সত্য নয়, ইহা নিছক সত্য। এ যেন এমন কতকগুলি বস্তু, যাহাদের ছায়া পড়ে না। কোনো-কিছুর সঙ্গে তুলনা করিবার উপায় না থাকাতে ইহাদের অবাস্তব মনে হওয়া অসংগত নয়। কিন্তু বস্তু ও তাহার ছায়ার মধ্যে ছায়াটাই কি অধিকতর বাস্তব? ছায়াটাই তো অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। ছায়া লইয়া যাহাদের কারবার, সেই অবাস্তববিলাসীদের জন্য প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিক'-এ একটু স্থানও রাখেন নাই। গুরুর এই একদেশদর্শিতার প্রতিবাদেই যেন অ্যারিস্টটলকে 'ইমিটেশন থিয়োরি' খাড়া করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল। শিল্প-বিচারের ইমিটেশন থিয়োরি বা criticism of life থিয়োরি— কোনো থিয়োরিই অবচেতনলোকের শিল্পবিচার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। শেষোক্ত থিয়োরি অনুসারেও বিচারের জন্য একটা অনুরূপ আবশ্যক। এই অনুরূপকেই ম্যাথু আর্নল্ড moral ideas বলিয়াছেন। তাঁহার মতে application of ideas to life-দ্বারাই কাব্যের মহত্ত্ব প্রমাণ হয়— আর application of ideas to life বলিতে দুটা বস্তু বোঝায়, 'আইডিয়া' ও 'লাইফ'। কিন্তু বস্তু যেখানে দুটা নয়, মাত্র একটা, সেখানে ইমিটেশন থিয়োরি সম্পূর্ণ অচল। কারণ এ-সব ছবিতে 'লাইফ' ও 'আইডিয়া' দুটা নাই, মাত্র আইডিয়াটাই আছে এবং সে-আইডিয়াটাও অবচেতনলোকের আইডিয়া (খুব সম্ভব সেখানে আইডিয়া ও রিয়ালিটি অভিন্ন), সেখানে সাহিত্য- ও শিল্প-বিচারের মাপকাঠি অচল। রবীন্দ্রনাথের ছবি এমন এক জগৎ যাহার মাপকাঠি ও কম্পাস এখনো অনাবিষ্কৃত। এখানকার নদী নদীমাত্র, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানিবার উপায় নাই; এখানকার জন্তু-জানোয়ার রূপমাত্র, তাহার অধিক নয়; এখানকার স্বল্প-সংখ্যক

নরনারীও নিছক রূপ, অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইহা নিছক রূপময় জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জাগতিক রূপ হইতে অরূপলোকে উত্থিত হইয়াছেন— ইহাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও -শিল্পের সাধারণ পরিচয়। জাগতিক রূপে ও অরূপে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার ছবির জগতে কেবল রূপটাই আছে, কোনো অরূপ-লোকের সঙ্গে তাহাকে equate করা, সম্বন্ধযুক্ত করা সম্ভব নহে। ইহা কি তাঁহার প্রতিভার ঐকান্তিক অরূপসাধনার nemesis?

৩

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবচেতনের আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ কী? তাঁহার পূর্বতন রচনা উচ্চেতনামূলক, তাহার লক্ষণ শান্তি, সংযম ও শালীনতা। তাহাদের স্থলে অধীরতা ও উদ্দামতার বিকাশের কারণ কী? সারাজীবনের সাধনালব্ধ ভারসাম্য হঠাৎ নষ্ট হইতে গেল কেন? অবচেতনলোকের সংবাদ আবর্তিত হইয়া উপরিতলে উঠিবার ফলেই অবশ্য এমন ঘটিয়াছে। কিন্তু সহসা এই আবর্তন কেন? বৃদ্ধবয়সে সজ্ঞান চেতনার মুষ্টি শিথিল হইলে অনেক সময়ে এমন হইয়া থাকে। সচেতন মনের মতো অবচেতন মনেরও একটা দাবি আছে। বৃদ্ধবয়সের সাধারণ দাবি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সেই সময়ে লুপ্তচৈতন্য অবস্থায় অবচেতন মনে অবগাহনের যে-অভিজ্ঞতা তাঁহার ঘটিয়াছিল, সেটাকেও একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। এই পীড়ার পরে 'প্রান্তিক' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা লিখিত। কাব্যখানিতে এমন-সব কবিতা আছে, কেবল সজ্ঞান মনের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা দুর্বোধ্য। অবচেতন মনে অবগাহনজনিত অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিলে তবেই তাহাদের বুঝিয়া ওঠা সম্ভব।

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে···
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নব নাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা···
বন্ধনমুক্ত আপনারে লভিলাম

সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

এ সেই অবচেতনলোক।

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।

এ-দেশ অবচেতনলোক।

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে,
বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারাল প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায় ; ক্ষয়-ক্ষীণ জ্যোতির্ময় আদি-মূল্য তার।

সজ্ঞান দৃষ্টি অবচেতনলোককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল— এবারে সেই অজ্ঞাত-লোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা।

. . .

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতি-পুঞ্জ।

. . .

মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব,
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার।

সজ্ঞান চৈতন্যের দীপ নিবিল, অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় দেহখানা তাহার অভ্যস্ত অনুভূতিপুঞ্জ বহন করিয়া অবচেতনলোকের বিরাট প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাধির বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে কবি পুনরায় সজ্ঞান মনের অভ্যস্ত ক্ষেত্রে ফিরিলেন বটে, কিন্তু কিছু সঙ্গে করিয়াও আনিলেন।

পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,

অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে।
আবেশ-আবিল স্বরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার।

প্রেতভূমিচারী অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামূর্তির মতো অকৃতার্থ অতীতের স্মৃতি কবির সঙ্গে সজ্ঞান মনের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী অনেক রচনায় তাহাদেরই পদচিহ্ন।

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য-প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগী-সম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

পূর্বোক্ত প্রেতের হাতছানিই তাঁহাকে বারংবার অভিজ্ঞতার অভ্যস্ত ক্ষেত্র হইতে উধাও করিয়া দিয়াছে—আর তাহারই ইঙ্গিতচারী কবি সোহিনীর অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

'প্রান্তিক' রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু নিঃসংশয়ে ইহা একটি পতাকীস্থান, সজ্ঞান মন ও অবচেতন মনের সীমান্তে এই পতাকা প্রোথিত। এই সাধারণ কথাটি মনে রাখিলে পরবর্তী অনেক রচনার রহস্যপ্রকাশ সহজ হইবে। বৃদ্ধবয়সের দরুন সজ্ঞান চৈতন্যের মুষ্টি শিথিল হওয়াতে পূর্ব হইতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও -চিত্রে অবচেতন সৃষ্টির চিহ্ন দেখিতে পাই, আর ১৯৩৭-এর ব্যাধির অভিজ্ঞতায় অবচেতনলোকের সহিত মুখোমুখি হইবার পরে উভয় মনের সিংহদ্বার খুলিয়া যাওয়াতে 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলিকে পাই। এই নূতন অভিজ্ঞতার চরম সোহিনী-চরিত্রে। সোহিনী অকৃতার্থ অতীতের সুযোগ্য প্রতিনিধি। প্রান্তিক-কাব্যে যাহার নির্গুণ তত্ত্ব, ল্যাবরেটরি গল্পে তাহার সগুণ মূর্তি। সুদীর্ঘ কবি-জীবনের ইহা যে উপান্ত্য রচনা, তাহা বোধকরি নিরর্থক নয়; কারণ ইতিপূর্বে তাঁহার হাত হইতে পাইয়াছি চেতন মনের ও উচ্চেতন মনের সৃষ্টি, অবচেতন মনের সৃষ্টি না পাইলে রবীন্দ্রকীর্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। রূপের সাধনা হইতে অরূপের সাধনায় যিনি পৌঁছিয়াছিলেন, গতরূপের সাধনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অভিজ্ঞতার জপমাল্য-আবর্তন তিনি সুসমাপ্ত করিলেন। সোহিনী-চরিত্র সমাপ্তির সেই সন্ধিস্থান—সেই হিসাবেই তাহার চরম মূল্য।

রমাসুন্দরী

ব ঙ্কি ম চ ন্দ্রে র ক পা ল কু ণ্ড লা র ও ময়মনসিংহ-গীতিকার মহুয়ার একটি ছোটো বোনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সে আর-কেহ নয়, প্রভাত মুখুজ্জের 'রমা-সুন্দরী' উপন্যাসের নায়িকা রমাসুন্দরী। রমাসুন্দরী নামটা বড়ো ভারি, কিন্তু মেয়েটি বড়ো লঘু, সৌন্দর্য তাহার যথেষ্ট আছে, কিন্তু নামের উপযুক্ত ভারিক্কি সে নয়, তার উপরে তাহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। শকুন্তলা ও তাহার হরিণ-শিশুকে দেখিয়া দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন যে, দুইজনই আরণ্যক। আমরা দুষ্মন্তের অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে কপালকুণ্ডলা, মহুয়া ও রমাসুন্দরী— তিনজনেই আরণ্যক। এই আরণ্যক শব্দে ইহাদের প্রকৃতির যেমন পরিচয় তেমন আর-কিছুতেই নহে। কপালকুণ্ডলা রসুলপুরের নদীর নির্জন বনে প্রতিপালিত, মহুয়ার নিবাস গারো পাহাড়ের পাদবর্তী সোমেশ্বরী নদীর জনহীন অরণ্যে, আর রমা-সুন্দরীর নিবাস সুন্দরবনের উপান্তে। রমাসুন্দরী জনপদ ও অরণ্যের সীমান্তে প্রতিপালিত, দুইয়েরই পরিচয় তাহার স্বভাবে আছে, কিন্তু বনের প্রভাবটাই কিছু বেশি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছুপরিমাণে আদিম স্বভাব প্রশ্রয় পায় না, চাপা পড়িয়া যায়, জনপদধর্মই ডালপালা মেলিয়া দেখা দেয়। কিন্তু দৈবাৎ কেহ বনে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইলে আদিম স্বভাব তাহাতে বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। তারপরে ঘটনাক্রমে জনপদে আসিয়া পড়িলে তাহাকে আর খাপ খায় না, সে কেমন বেমানান হয়। কপালকুণ্ডলা সমাজে এমনি বেমানান হইয়াছিল, নিরুপায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাহাকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। মহুয়ার স্রষ্টা তাহাকে জনপদে আনিয়া আবার অরণ্যে লইয়া গিয়াছেন, বেমানান হইবার সমস্যা তাহার নয়। তা ছাড়া কপালকুণ্ডলা ও মহুয়া দু-জনেই শিশুকাল হইতে সমাজভ্রষ্ট, অরণ্যের নিরবচ্ছিন্ন হস্ত তাহাদের একভাবে পালন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু রমাসুন্দরীর জীবনচিত্র ভিন্ন। সে সংসারেরই বটে, গ্রামেই মানুষ ; কিন্তু গ্রামের কাছেই সুন্দরবন, সেই সুন্দরবনের প্রভাবে তাহার চরিত্রের একটা দিক মাত্র বিকশিত হইয়াছে, অন্য দিকটার উপরে গ্রামের প্রভাব বর্তমান। তাহার চরিত্রের যে-দিকটায় অরণ্যের প্রভাব

সে-দিকে সে অনন্যসাধারণ, অপর দিকে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। তাই যখন সে অরণ্যভ্রষ্ট হইয়া বিবাহিত হইবার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে চলিয়া গেল তখন আর সে তেমন ভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, তখন সে যেন কেমন সাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। অরণ্যচারিণী রমার চিত্রাঙ্কনে লেখক যে-কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, গৃহিণী রমার চরিত্রে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। এই বন্য রমাই আমাদের আলোচ্য।

ছোটোগল্প-রচনায় প্রভাতকুমারের যে-নিপুণতা ও নির্মমতা দেখা যায় উপন্যাসে তাহার একান্ত অভাব। তাঁহার উপন্যাসগুলির উপরে একপ্রকার ভাবালুতার কুহেলিকা আসিয়া সব কেমন যেন অস্পষ্ট ও বিসদৃশ করিয়া দেয়। এমন কেন হইল? খুব সম্ভব তিনি ছোটোগল্প লিখিতেন নিজের তাগিদে, আর পাঠকের তাগিদ তাঁহাকে উপন্যাস লেখাইত, তাই ছোটোগল্পের শিল্পধর্ম হইতে তাঁহার উপন্যাসগুলি ভ্রষ্ট। তাঁহার উপন্যাসগুলি নানা দুঃখদুর্দৈবের হাত এড়াইয়া সর্বদাই পাঠক-স্পৃহিত 'আমার কথাটি ফুরালো, নটেগাছটি মুড়ালো' মনোভাবের মিলনান্ত সমে আসিয়া সমাপ্ত হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহাই একমাত্র কাম্য। সে কোনো বেদনাবোধ লইয়া, কোনো দুশ্চিন্তা লইয়া পুস্তক বন্ধ করিতে চায় না। গল্প শেষ হইয়া গেল, অথচ তাহার প্রেতাত্মা তাহার মধ্যে অদৃশ্য বেদনা বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহার নিত্যকর্মে অন্যমনস্কতা আনিয়া দিবে— ইহাকে সে অবাঞ্ছিত মনে করে। বই শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই গল্পের আত্মশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ হইয়া গিয়া সব বেদনা-শান্তি ঘটিবে, লেখকের কাছে সাধারণ পাঠকের ইহাই দাবি। উপন্যাস-রচনায় পাঠকের প্রভাবে সেই দাবিকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করিয়াছেন। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসেও করেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, অমন অনন্যসাধারণ একটি বালিকা-চরিত্রকে মিলনান্ত সংসারসমুদ্রে বিসর্জন দিয়া তিনি কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক অবশ্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছে— কিন্তু কাহারো-কাহারো মনে অতৃপ্তি ও খেদ এবং একটা অভিযোগ রহিয়া যায়। আমারও আছে। নিজের কীর্তি নষ্ট করিবার অধিকার লেখকের আছে কি না সে-তর্ক স্বতন্ত্র, কিন্তু তজ্জন্য কোনো পাঠক যদি অভিযোগ করে তবে সে-অভিযোগ লেখককে শুনিতে হইবে বইকি!

কিন্তু এখানে সে-তর্কের মধ্যে গিয়া কাজ নাই— তার চেয়ে আরণ্যক রমার

পরিচয় লওয়া যাক, বেশি আনন্দ পাওয়া যাইবে।

'যে মেয়েটির নাম রমাসুন্দরী, সেটি ভারি সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী হইলে কি হয়, তাহার ধাত্রীর শিক্ষাবৈগুণ্যেই হউক, বা জন্মনক্ষত্রফলেই হউক, মেয়েটি ভারি দুর্দান্ত। ভাগ্যে তাহার পিতার জঙ্গলে বাস, নচেৎ সমাজে তাঁহার মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকিত না। রমা বন্য বিড়ালীর বৃক্ষারোহণ করিয়া থাকে। স্নান করিতে গিয়া পিয়ালী নদীটিকে একেবারে তোলপাড় করিয়া আসে। ছিপ লইয়া পুকুরে মাছ ধরে, এমনকি তীরধনুক পর্যন্ত ছুঁড়িতে জানে। রমা লছমীর প্রাণ। ছেলেবেলা হইতে লছমী তাহাকে সাধ করিয়া আপনার মেয়ের মতো করিয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরানো অভ্যস্ত করিয়াছে, এখন পর্যন্ত রমা প্রায়ই তাহা করে।'

লছমী রমার ধাত্রী, সে রাজপুত নারী।

রমার আরও অনেক গুণ। সে বনে-বনে ঘুরিয়া পাখি শিকার করে, বনের গাছে উঠিয়া ফল পাড়ে, গ্রামের চেয়ে বনেই সে বেশি অভ্যস্ত।

এইরকম বনভ্রমণের সময়ে একদিন জমিদারপুত্র যুবক নবগোপালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। নবগোপালের আমন্ত্রণে নিঃসংকোচে তাহার সহিত সে শিকার করিতে গেল। এমন বারকয়েক ঘটিল। রমার পিতা এজন্য নবগোপালের কাছে অনুযোগ করিলেন। নবগোপাল রমার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিল— সে বিবাহের প্রস্তাব করিল। রমার পিতা স্বীকৃত হইলেন। রমা সংবাদটা জানিল। লেখক বলিতেছেন, 'রমাকে কেহ শিখায় নাই যে, বিবাহ-প্রসঙ্গে লজ্জা করিতে হয়।' প্রায় কপালকুণ্ডলার মতোই অবস্থা। কিন্তু উভয়ের পরিণাম কী স্বতন্ত্র! 'কপাল-কুণ্ডলা'-উপন্যাস কাব্য, আর 'রমাসুন্দরী' উপন্যাস বয়স্ক পাঠকের রূপকথা। দুইয়ে মিল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তারপরে অনেক দুঃখসংকটের মুষ্টি এড়াইয়া রমার সঙ্গে নবগোপালের বিবাহ হইল এবং কিয়ৎকাল পিতার সহিত মনোভেদের পরে পিতাপুত্রে আবার মিলন ঘটিল। কিন্তু আমরা ততদূর যাইতে রাজি নই, বিবাহ-পূর্ব রমাতেই আমাদের আকর্ষণ!

বিবাহ-পূর্ব বন্য রমা বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব নারীচরিত্র। যে-কারণে কপালকুণ্ডলা ও মহুয়া অপূর্ব, সেই কারণেই রমাসুন্দরীও অপূর্ব এবং বাংলা সাহিত্যের নরনারীর মধ্যে এমন অনন্যসাধারণ।

বাঙালিসমাজ গৃহকেন্দ্রিক, সংসারচক্রের বাহিরে তাহার পরিচয় সংকীর্ণ। বাংলা সাহিত্য তো সেই সমাজেরই প্রতিবিম্ব— সেখানেও যে-সব নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাহারা সকলেই গতানুগতিক ; যে বিশিষ্ট, গতানুগতিকের ক্ষেত্রেই সে বিশিষ্ট। তাই গতানুগতিকের বাহিরে কাহাকেও চোখে পড়িলে খুব বেশি করিয়া সে মনোযোগ আকর্ষণ করে। কপালকুণ্ডলা, মহুয়া ও রমাসুন্দরীর পরিবেশের অনন্য-সাধারণত্বই তাহাদের আকর্ষণের প্রধান কারণ। তাহাদের বিচার করিবার সময়ে এইটি মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-চরিত্রটি বিচিত্র-মহৎ সম্ভাবনায় পূর্ণ। ইহাতে এক-দেহে ব্যক্তিরূপ, শ্রেণীরূপ ও জাতিরূপের সম্মিলন ঘটিয়াছে। শ্রীকান্ত একাধারে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষ-এক সময়ের, একশ্রেণীর বাঙালি এবং পুরুষজাতির চিরন্তন প্রতিনিধি। সাহিত্যে এমন সম্মিলন কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, সেইজন্যই চরিত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ব্যক্তি-শ্রীকান্ত সম্বন্ধে এখানে বিশদ আলোচনা বাহুল্য, কারণ পাঠকমাত্রেই শ্রীকান্তর ব্যক্তিস্বরূপ অবগত। সে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত নরনারীর জনতার মধ্যে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যাইবে। তাহার পোশাকপরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচারব্যবহার— সবতাতেই এমন স্বকীয়তা আছে যে তাহাকে আর-পাঁচজনের সহিত মিশাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা নাই। প্রথম পর্বের বালক শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে পরিণত-বয়স্ক— ঠিক কত বয়স, লেখক খুলিয়া বলেন নাই, তবে অনুমান করা যাইতে পারে। চতুর্থ পর্বে কমল-লতাকে দেখিতে পাই। লেখক বলিতেছেন, তাহার বয়স ত্রিশের ধারে-কাছে, রাজলক্ষ্মী তাহার চেয়ে কিছু ছোটো হইবে। রাজলক্ষ্মীর বয়সের আভাস আছে পঁচিশ-ছাব্বিশ। কমললতা ও রাজলক্ষ্মী— দু-জনের চেয়েই শ্রীকান্তর বয়স কিছু বেশি, রাজলক্ষ্মীর উক্তি হইতে জানিতে পারি তাহার চেয়ে শ্রীকান্ত পাঁচ-ছয় বছরের বড়ো— তাহা হইলে শ্রীকান্তর বয়স দাঁড়ায় ত্রিশের উপরে, কমললতার চেয়ে সামান্য কিছু বড়ো। চতুর্থ পর্বের শ্রীকান্তর বয়স যদি বত্রিশের কাছাকাছি ধরি, তবু সে-বয়স এমন-কিছু বেশি নয়; যৌবন তো বটেই, এমনকি প্রথম-যৌবন বলিতেও কুণ্ঠিত হইব না। বয়সের হিসাব এমন খুঁটাইয়া করিলাম বলিয়াই তাহার বয়সের তারুণ্য ধরা পড়িল— নতুবা তাহাকে প্রৌঢ় বলিয়া ধরাই স্বভাবিক। তথ্যের সহিত বয়সটা মিলাইবার আগে আমার নিজেরই ধারণা ছিল যে, চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্তর বয়স চল্লিশের চেয়ে পঞ্চাশের অঙ্কের কাছ-ঘেঁষা। কিন্তু বয়সটাই তো সব নয়, ওটা দেহগত ব্যাপার। মনেরও একটা বয়স আছে, অনেক সময়েই দেহের বয়সে ও মনের বয়সে তারতম্য ঘটে। মানুষের পক্ষে মনের বয়সটাই মুখ্য

—ওখানেই তাহার যৌবনের শেষ, প্রৌঢ়ত্বের সূচনা বা বার্ধক্যের পরিচয়। এখন প্রশ্নটা এই : শ্রীকান্তর মনের বয়সের ও দেহের বয়সের প্রভেদের কারণটা কী? এখানেই তাহার শ্রেণীরূপের বিতর্ক আসিয়া পড়িবে।

শ্রীকান্ত যে-শ্রেণীর অর্থাৎ যে-প্রজন্মের (generation) বাঙালির প্রতীক তাহারা যৌবনেই বার্ধক্যের বাহন। সে-যুগের বাঙালি কিশোরবয়সেই যৌবনটাকে ডিঙাইয়া একেবারে প্রৌঢ়ত্বে ডবল প্রোমোশন পাইয়াছে। সাগরপারে যাহাকে বলে 'যুগান্তের ক্লান্তি' (fin de siècle), তাহারই আভাস তাহার কায়মনোবাক্যে —শতাব্দীর সূর্যাস্তের করুণ আভায় তাহার মনের শাখাপল্লব যেন শুষ্ক। সে-প্রজন্মের বাঙালির ট্রাজেডি এই যে, তরুণদেহে সে প্রৌঢ়— দেহগত যৌবন সত্ত্বেও সে অবসন্ন, তাহার প্রভাতের আলোতে কয়েক পোচ সন্ধ্যার কালিমা মিশ্রিত। শ্রীকান্ত তাহাদের প্রতিনিধি।

এ-বাঙালি কোন্ যুগের? গত দুই প্রজন্মের বাঙালি অদৃষ্টের ক্রীড়নক, স্রোতের ভাসমান তৃণখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ঘটনাপ্রবাহের বেগ তাহার চারিত্রশক্তির চেয়ে প্রবলতর হইয়া ওঠাতে সে তাহার বিরুদ্ধে চলিতে পারিতেছে না, স্রোতের বেগে গা ভাসাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে, কিংবা বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পর হইতে এই যুগের সূচনা বলা যাইতে পারে। ইতিহাসের যুগ চিরদিন একটা নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম রেখা হইতে গণনা করা যায় না— তবে একটা স্থূল সময় নির্দেশ করা অসম্ভব নহে। বাংলা-দেশের গত শতাব্দীর গৌরবময় যুগ ধীরে-ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, বাঙালিসমাজের শক্তি ক্ষীয়মাণ হইতেছিল— রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ অবধি বহুসংখ্যক মনীষীর সৃষ্টি করিয়া সমাজের আত্মা যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল— এবারে তাহার সাময়িক বিরামের পালা। গত শতাব্দীতে ধর্মসাধনায়, রাষ্ট্র-সাধনায়, শিল্পে এবং সাহিত্যে বাঙালি যে-নৈপুণ্য ও দিগ্‌দর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল সে-ক্ষমতা যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল— সে যেন মনের মধ্যে অপরাহ্নের ক্লান্তি-জনিত একটা নৈরাশ্যের ভাব অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় ঠিক এই সময়টাতে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য পারদ-যন্ত্রের মতো বাঙালিসমাজের মানসিক গতিবিধিকে, তাহার মানসিক উত্তাপকে অর্থাৎ উত্তাপের হ্রাসকে সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ

পুরুষচরিত্র উক্ত ভাবের প্রতীক। শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের অধিকাংশই বহুল-পরিমাণে নিষ্ক্রিয়, উদ্যমহীন, লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন; ঘটনার তাড়নাতে ভাসিয়া যাওয়াই যেন তাহাদের ধর্ম। বুদ্ধিতে তাহারা ক্ষীণ নহে, ধীশক্তিও তাহাদের প্রচুর— কেবল যে-উদ্যম থাকিলে, উদ্দেশ্য থাকিলে, লক্ষ্য সম্বন্ধে চৈতন্য থাকিলে জীবন সার্থক হইয়া ওঠে তাহারই অভাব। এ-বিষয়ে শ্রীকান্ত শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের প্রতিনিধি এবং বাঙালিসমাজের প্রতীক। নূতন যুগের দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষ রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমিত রায় এই নূতন যুগের মানুষ। হাতে কোনো মহৎ কার্য না থাকায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে বাঙ্‌নৈপুণ্যে প্রকাশ করাই যেন অমিত রায়ের একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোরার সহিত অমিত রায়ের প্রভেদটা এইখানে। গোরা পূর্ববর্তী যুগের মানুষ, অমিত পরবর্তী যুগের। অমিত সুশিক্ষিত, শহরাশ্রয়ী ধনীসমাজের প্রতিনিধি; আর শ্রীকান্ত প্রতিনিধি সাধারণভাবে বাঙালিসমাজের।

শ্রীকান্ত তাহার জীবনের চারটি পর্বের ঘাটে-ঘাটে ভাসিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কোথাও শমে আসিয়া পৌঁছিবার লক্ষণ দেখায় নাই। শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিলে আরও চারটি পর্ব লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতেও শ্রীকান্ত শমে পৌঁছিত না— কারণ তাহার যাত্রাপথে কোনো শম বা লক্ষ্য বলিয়াই যে কিছু নাই।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। শ্রীকান্ত-উপন্যাসের প্রত্যেক পর্বই একই উদ্দেশ্যহীনতার, লক্ষ্যহীনতার সুরে প্রারব্ধ।

'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে আসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই তো বুড়া হইলাম।...মনে হইতেছে, হয়তো ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভালো ছেলে হইয়া এগ্‌জামিন পাশ করিবার সুবিধাও করিয়া দেন না...বুদ্ধি তাহাকে হয়তো কিছু দেন কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না...তারপর সেই মন্দ ছেলেটা যে কেমন করিয়া অনাদর-অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে, সুদীর্ঘ দিন তাহার কোনো উদ্দেশই পাওয়া যায় না।' (প্রথম পর্ব)।

আবার—

'এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই তাহার ছিন্ন সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে।···তাই আজ এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর-একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' (দ্বিতীয় পর্ব)

পুনশ্চ—

'একদিন যে ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকটা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্ঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না।' (তৃতীয় পর্ব)

এবং—

'এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মতো। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। এমনি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে?' (চতুর্থ পর্ব)

ভবঘুরে শ্রীকান্তের চিরজীবন এমনি করিয়াই কাটিবে— কেবল শ্রীকান্ত ভবঘুরে নয়, কেবল তাহার জীবন ছন্নছাড়া নয়, তাহার প্রজন্মের সমস্ত বাঙালিই ভবঘুরে, তাহাদের সকলেরই জীবন ছন্নছাড়া। সে বাঙালিসমাজের যথার্থতম প্রতি-নিধি, তাই সে বাঙালিসমাজের এমন প্রিয়, তাই তাহার স্রষ্টা বাঙালিসমাজের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।

কোনো-কোনো নারীচরিত্রকে 'চিরন্তনী নারী' বলা হইয়া থাকে। শ্রীকান্ত 'চিরন্তন পুরুষ'— এই কারণেই তাহাকে পুরুষজাতির প্রতিনিধি বলিয়াছি। পুরুষের মন উদাসীন, বৈরাগী-জাতীয়। তাহার জীবনটাই কেবল ভবঘুরে নয়, তাহার মনটাও ভবঘুরে— সকল পুরুষেরই মন ভবঘুরে। সংসারচক্রে পুরুষ কেন্দ্রাতিগ শক্তি, কেন্দ্রাভিগ নারী তাহাকে টানিয়া রাখিতে চাহিতেছে— আর এই দুই শক্তি মিলিয়া সংসারচক্রের আবর্তন করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রমতে 'জগতঃ পিতরৌ' মহাদেব ও অন্নপূর্ণা আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নারী। মহাদেব

সর্বত্যাগী ভিক্ষুক, তাঁহার মনটা উদাসীন, বৈরাগী-জাতীয়; অন্নপূর্ণার মন গৃহস্থের মন, তিনি আদর্শ গৃহিণী।

প্রকৃতি এ-খবরটা ভালো করিয়াই জানে, তাই উদাসীন পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নারীকে শোভায় সৌন্দর্যে ছলকলায় একেবারে চতুরঙ্গ বাহিনীতে সজ্জিত করিয়া তবে সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছে। এইজন্যই নারী নিজেকে বেশভূষায় বসনে অলংকারে বিভূষিত করিয়া রাখে— তবু তাহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা, এত আয়োজন সত্ত্বেও বুঝি সে পুরুষকে টানিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না। তাই তার প্রেম আর স্বস্তি পায় না— সে অফুরন্ত ভালোবাসা ঢালিয়াই দিতেছে, পুরুষ তাহা নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করে। নারী দাতা, পুরুষ গ্রহীতা; নারী সক্রিয়, পুরুষ নিষ্ক্রিয়; নারী শক্তি, পুরুষ নির্বিকার। এই মৌলিক তত্ত্বটি অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্রকারকে তাহার দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে।

শ্রীকান্ত- ও রাজলক্ষ্মী-চরিত্র অবলম্বনে শরৎচন্দ্র এই মৌলিক তত্ত্বটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর অতুলনীয় প্রেম, ভক্তি, নির্বন্ধাতিশয্য শ্রীকান্তকে কিছুতেই টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তাহাকে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর সন্দেহ ঘুচিতে চায় না যে, সে তাহাকে পাইয়াছে। তাহার সন্দেহ অকারণ নয়, শ্রীকান্তকে সর্বতোভাবে কখনো সে পায় নাই, কখনো পাইবে না, কারণ কোনো নারীই কোনো পুরুষকে কখনো সাকল্যে পায় না— ইহা নারীও জানে, পুরুষও জানে। এইজন্যই নরনারীর প্রেমে একটি অপূর্ব রহস্য এবং অভাবনীয় অতৃপ্তি থাকিয়া যায়— ইহাতেই প্রেমের লীলা। শ্রীকান্ত-উপন্যাস এই লীলারসেরই ইতিহাস।

উপন্যাসখানির চারি পর্বে চারিটি মহৎ নারীচরিত্র বিবৃত। প্রথম পর্বে অন্নদাদিদি, দ্বিতীয় পর্বে অভয়া, তৃতীয় পর্বে সুনন্দা আর চতুর্থ পর্বে কমললতা। চারিটি নারীচরিত্রেই এই লীলার রস উদ্বেল। অন্নদাদিদি তাহার সাপুড়ে বিধর্মী স্বামীকে আয়ত্ত করিয়া রাখিবার আশায় সংসারত্যাগী; দেশত্যাগী অভয়ার মনে হয় রোহিণীকে শেষ পর্যন্ত সে হাতে রাখিতে পারিবে কি না; তেজস্বিনী সুনন্দা অসাধারণ তেজস্বিতার দ্বারাই স্বামীকে স্ববশে রাখিয়াছে; আর কমললতা কাহারো উপরে আপনার প্রভাব খাটাইতে পারে নাই বলিয়া মথুরাপুরের আশ্রমে টিকিতে পারিল না। কিন্তু এই লীলার পরিপূর্ণতম ইতিহাস রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের

কাহিনীতে। তাহাদের কাহিনীই এই উপন্যাসের স্থায়ী রস, আর পূর্বোক্ত চারিজন নারীকে চারিপর্বের সঞ্চারী রস বলিলে অন্যায় হইবে না।

চতুর্থ পর্বের শেষেও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারে নাই —শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিলে আরও চারি পর্ব লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান ঘটিত না। এক-একটা উদাসীন নক্ষত্র ভীম-বেগে অপর তারকার নিকট আসিয়া পড়িয়া তাহার বক্ষে অগ্নিময় উচ্ছ্বাস জাগাইয়া দিয়া যেমন আর ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যায়— তেমনি বার-বার শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর চিত্তে অগ্নিরস উদ্বেল করিয়া দিয়া পলাইয়াছে— ইহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয়, ইহাই পুরুষের স্বভাব। চিরন্তন নরনারীর আদিতম আকর্ষণ-বিকর্ষণ এমন করিয়া আর-কোনো বাংলা উপন্যাসে চালিত হইয়াছে কিনা জানি না। খুঁটাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই এই লীলাদ্বন্দ্বের কাহিনীর মনোরম আধার। ইহাই তাঁহার জীবনতত্ত্ব, যে-জীবনতত্ত্ব শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তি। তবে ইহার পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীকান্ত-উপন্যাসে— সেই-জন্যই ইহা শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

রাজলক্ষ্মী

শরৎ-সাহিত্যে প্রধান নরনারীর চরিত্র-কল্পনায় একটি বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। চারি পর্বে সমাপ্ত শ্রীকান্ত-উপন্যাসখানিকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্তি বলা যাইতে পারে। এই বইখানাকে অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিলে কাজটা সহজ হইবে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী চরিত্র-দুটিকে শরৎ-সাহিত্যের প্রধান নরনারীর প্রতীকস্থানীয় মনে করিলে অন্যায় হইবে না। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রেমের বিকাশ ও পরিণামকে শরৎ-সাহিত্যের প্রধান নরনারীর সম্পর্কের প্রতীকস্থানীয় বলা যায়। কাজেই শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিলে সাধারণভাবে শরৎ-সাহিত্যের নরনারীর প্রেমের প্রকৃতি জানিতে পারা উচিত।

বিবাহ-সম্পর্কের বাহিরে নরনারীর প্রেমের স্থান ও স্থায়িত্ব কোথায়—এই সমস্যাটি শরৎচন্দ্রকে বিশেষ ভাবিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নিতান্ত অল্পবয়সের রচনাতেও এই সমস্যার পূর্বাভাস বর্তমান। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সমস্যাটির সূচনা, পরিণাম, সিদ্ধান্ত তাঁহার রচনায় যে-বিবর্তন পাইয়াছে, তাহার আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই, আর তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রও ইহা নয়। সাধারণভাবে এবং সংক্ষেপে বিষয়টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যাইতে পারে।

মানুষের মনে স্বভাবধর্ম ও সমাজধর্ম দুই-ই সক্রিয়। স্বভাবধর্মের প্রেরণাতেই অবিবাহিত নরনারীর মধ্যে, বা যেখানে বিবাহের সম্ভাবনা নাই সেখানে, প্রেমের উন্মেষ হইতে পারে। এখানে মানুষ অনেক পরিমাণে অসহায়, সে 'না' বলিলেও তাহার মানবস্বভাব তাহাতে সব সময়ে কর্ণপাত করে না। আবার তাহার মনে সমাজধর্মও সক্রিয়। সমাজধর্ম সব সময়ে স্বভাবধর্মের অনুকূল নয়। স্বাভাবিক প্রেমকে সামাজিক প্রেম বলিয়া গ্রহণ করা সব সময়ে ঘটে না। তখন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া ওঠে, তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। তখন মানুষের কর্তব্য কী?

বঙ্কিমচন্দ্র এ-সমস্যাটিকে পুরাপুরিভাবে আলোচ্য বিষয় করিয়া তোলেন নাই। যেখানে এ-জাতীয় সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে বাধা এমন দুস্তর যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিতে তাঁহার অসুবিধা হয় নাই। যেমন মোতিবিবি ও নবকুমারের ক্ষেত্রে, কিংবা আয়েষা ও বীরেন্দ্রসিংহের ক্ষেত্রে। এ-দুটি স্থানে বাধা ধর্মের, সে-বাধা দুস্তর, আশার বস্তু অপ্রাপ্য; যাহা স্বভাবত অপ্রাপ্য তাহা না পাইলে দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু সেই দুঃখকেও লোকে স্বভাবের নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি বিনোদিনীকে বিহারীর করায়ত্ত হইতে দেন নাই। এমনকি বিহারী তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইলেও বিনোদিনী পিছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেন যে সে পিছাইয়া গেল তাহার বিস্তৃত কারণনির্দেশ বিনোদিনী বা লেখক করেন নাই।

শরৎচন্দ্র সেই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে-প্রেমের সামাজিক স্থায়িত্ব বা মর্যাদা নাই সে-প্রেমকে সমাজে স্থায়ী করিতে গেলে সমাজ ও প্রেম উভয়েরই মাহাত্ম্য-হানি হয়। শরৎচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমকে অস্বীকার করেন নাই, তাহাকে হীন মনে করেন নাই; কিন্তু অবাঞ্ছিত ক্ষেত্রে তাহাকে সামাজিক স্থিতি দানেরও চেষ্টা করেন নাই। মানবিক মহত্ত্ব ও সামাজিক মর্যাদাকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের বস্তু মনে করেন; কিন্তু মানবিক মহত্ত্ব-মাত্রেই যে সমাজিক মর্যাদা পাইবে, এমনও তিনি আশা করেন না। সাবিত্রীতে, চন্দ্রমুখীতে মানবিক মহত্ত্ব আছে, কিন্তু যে-সামাজিক মর্যাদা হইতে তাহারা চ্যুত সেখানে তিনি তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করিবার বৃথা চেষ্টা করেন নাই। সন্ন্যাসীর যেমন মানবিক মহত্ত্ব আছে, কিন্তু তাহাদের স্থান কি সমাজে আছে? সন্ন্যাস লইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহারা পূর্বাশ্রমের সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন। কোনো কারণে যাহারা সমাজচ্যুত হইয়াছে, অথচ মানবিক মহত্ত্ব হারায় নাই, তাহাদের অনুকূলে শরৎচন্দ্র অনেকটা সেইরূপ পাঁতি দিয়াছেন। তাহারা হীন নহে, ঘৃণার যোগ্য নহে, বরঞ্চ অনেক বিষয়েই তাহারা শ্রদ্ধার পাত্র, অনুকরণের যোগ্য, তবু সমাজের মধ্যে তাহাদের টানিয়া আনা চলে না। সাবিত্রীর বস্তুনিষ্ঠ চিত্ত সমস্যার এই দ্বৈতরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিল এবং এই একটিমাত্র কারণেই সে সতীশের বিবাহপ্রস্তাবে রাজি হইতে পারে নাই।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সুগভীর আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক বন্ধনে যে তাহারা মিলিত হইতে পারে নাই, চারিটি পর্ব ধরিয়া তাহারা যে সমান্তরালভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে, আরও চারিটি পর্ব লিখিলেও যে তাহাদের মিলন ঘটিয়া উঠিত না, তাহার কারণ— তাহাদের প্রেমের সামাজিক ভূমির অভাব। পুরুষ বলিয়া শ্রীকান্ত হয়তো কথাটা স্পষ্টভাবে বলে নাই, কিন্তু রাজলক্ষ্মী অনেকবার আভাসে ও বিশদভাবে কথাটা শ্রীকান্তকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মত এই যে, রাজলক্ষ্মীর মানবিক মহত্ত্ব অবিসংবাদী, সমাজের ভূষণ হইবার সে যোগ্য; কিন্তু ভূষণ তো অঙ্গ নয়, সমাজের অঙ্গীভূত হইবার অধিকার তাহার নাই। তাঁহার মতে রাজলক্ষ্মীকে শ্রদ্ধার সহিত মনের অন্দরমহলে আহ্বান করিতে হইবে, কিন্তু বাসরঘরে তাহাকে বধূরূপে আহ্বান করা চলিবে না। এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী উভয়েই একমত।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের মুখ্য নারীচরিত্র রাজলক্ষ্মী। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে চারি পর্বে চারিজন প্রধানা নারী বর্তমান— অন্নদাদিদি, অভয়া, সুনন্দা ও কমললতা। রাজলক্ষ্মীর তুলনায় তাহারা গৌণ হইলেও প্রত্যেক পর্বে তাহাদের প্রভাব প্রায় প্রধান চরিত্রের মতোই। ইহাদের রাজলক্ষ্মীর উত্তরসাধিকা বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সুনন্দাকে ছাড়া আর-কাহাকেও সামাজিক দৃষ্টিতে সতী বলা যায় কিনা সন্দেহ। ইহারা সকলেই অসাধারণ রমণী। অন্নদাদিদি সামাজিক দৃষ্টিতে অসতী বলিয়া পরিচিত হইলেও সতী-শিরোমণি। স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই সে অসতীত্বের অপবাদ বরণ করিয়া লইয়াছে। অভয়ার সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। রোহিণীদার সঙ্গে সম্বন্ধ আর-যেমনই হোক, যৌন সম্পর্কে পৌঁছায় নাই —অন্তত সেইরকম ধারণাই লেখক দিয়াছেন। কমললতাও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কেবল সুনন্দা ভিন্ন পর্যায়ের। পূর্বোক্ত তিনজন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া যে-অসাধারণত্ব দেখাইয়াছে, সুনন্দা স্বামী ও সমাজ আঁকড়াইয়া থাকিয়াই তাহা দেখাইতে পারিয়াছে। চারিজনের মধ্যেই মানবিক মহত্ত্ব বর্তমান; সুনন্দার বেলায় মানবিক মহত্ত্ব ও সামাজিক মর্যাদা দুই-ই বর্তমান, অপর তিনজন সামাজিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত।

কিন্তু মোটের উপরে বলা যায় যে, রাজলক্ষ্মীতে যে-ভাব, ইহাদের মধ্যেও সেই ভাব; প্রভেদের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র সমগ্র উপন্যাসখানির স্থায়ীভাব, অপর তিনজনের সঞ্চারীভাব, তাহাদের এক-একজনের অধিকার এক-এক পর্বে মাত্র। খুব সম্ভব স্থায়ীভাবের রসকে গাঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যেই লেখক সঞ্চারী-ভাবের অবতারণা করিয়াছেন। এই চারিটি নারীচরিত্রকে রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের অনুষঙ্গীরূপে গ্রহণ করিলে তবেই পরস্পরের সান্নিধ্যে সকলকে বুঝিবার যথার্থ ভূমিকা রচিত হইবে।

রতন

ইংরাজিতে একটি কথা আছে যে, কল্যাণী বধূ লাভ বিধাতার আশীর্বাদ। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু যে-সব হতভাগ্যের কপালে কল্যাণী বধূ জুটিল না তাহাদের সান্ত্বনা কোথায়? তাহাদের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ হইতেছে একটি মনোমত সেবক লাভ। কল্যাণী বধূব পরেই কল্যাণকর সেবক। অবশ্য একই পরিবারে একই সময়ে কল্যাণী বধূ ও কল্যাণকর সেবক খাপ খায় কিনা জানি না। খুব সম্ভব খায় না। প্রবল পক্ষের তেজে অপর পক্ষ দুর্বল হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; কিন্তু বধূর প্রভাব হইতে দূরে আসিবামাত্র তাহার কল্যাণহস্ত প্রসারিত হইয়া দেখা দেয়, রোগের সেবায় এবং শোকের সান্ত্বনায়। প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি। দেশে থাকিতে গৃহিণীর প্রভাবে সে ছিল সবচেয়ে অবাঞ্ছিত, কিন্তু বিদেশে রোগশয্যায় তাহার কী কল্যাণমূর্তিই না উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল!

কল্যাণী বধূর ভারা বাঁধিয়া যে-ব্যক্তি জীবনে ভারসাম্য লাভ করিতে অসমর্থ হইল সেই ভবঘুরের পক্ষে মনোমত একটি সেবক লাভ অদৃষ্টের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। আমার এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে শরৎচন্দ্রেব উপন্যাস। এমন বিশ্বস্ত ভৃত্যের চিত্র আর কোথায় আছে? কোথাও যে নাই তার কারণ, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ প্রধান নায়ক ভবঘুরে, কাজেই স্বাভাবিক অভাবের বশে আর স্বভাবের আকর্ষণের বশে তাহারা একটি করিয়া পুরাতন ভৃত্য জুটাইয়া লইয়াছে। গ্রহের সঙ্গে যেমন উপগ্রহ— দু-জনকে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিবার আর উপায় নাই। সতীশের বিহারী, দেবদাসের ধর্মদাস, আর শ্রীকান্তের রতন। রতন অবশ্য মূলে ছিল রাজলক্ষ্মীর ভৃত্য, কিন্তু শেষপর্যন্ত শ্রীকান্তের পুরাতন ভৃত্য হইয়াছে। আর যারই সন্দেহ থাক, ঐ ধূর্ত নাপিতের সংশয়মাত্র ছিল না সে কাহার ভৃত্য। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধটা সে শুধু জানিয়া লয় নাই, মানিয়াও লইয়াছিল। শ্রীকান্ত, সতীশ ও দেবদাস— তিনজনেই ভবঘুরের চরম, আর তাহাদের সেবকত্রয় একাধারে ভবঘুরে-বৃত্তির কার্য ও কারণ। ভবঘুরে বলিয়াই সেবকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, আবার তেমন সেবক মিলিয়াছে বলিয়াই ভবঘুরে-বৃত্তি অবাধে চলিতে পারিয়াছে। আর-এক ভবঘুরে জীবানন্দ। তাহার সঙ্গে শরৎচন্দ্র কেন যে একটি মনোমত সেবক জুড়িয়া দিতে ভুলিয়া গেলেন!

শরৎচন্দ্রের পুরাতন ভৃত্যের চিত্র আঁকিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে-কোনো একজনকে লইলেই চলিবে, কারণ সকল দেশের সকল কালের 'পুরাতন ভৃত্যের চরিত্র একই ছাঁচে ঢালা, পুরাতন ভৃত্যের দল' ইন্‌ডিভিজুয়াল নয়, একটি 'টাইপ'। এ-ক্ষেত্রে আমরা শ্রীকান্তের রতনকে গ্রহণ করিব। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া দিলে এই লোকটি সম্বন্ধেই আমরা সবচেয়ে বেশি জানি এবং লোকটা অপ্রধান চরিত্র-শ্রেণীভুক্ত হইয়াও অত্যন্ত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিরা স্বকীয় প্রেমের উর্ধ্বে পরকীয়া প্রেমকে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পরকীয়া প্রেম বলিয়া একটা মনোভাব যদি থাকে তবে রতনের জীবনচরিত হইতে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

রতনের সঙ্গে শ্রীকান্তের (বা রাজলক্ষ্মীর) সম্বন্ধটা কোন্ সূত্রে গ্রথিত ? সে কি কেবল মাসিক বেতনের উপর নির্ভরশীল ভৃত্য-মনিবের সম্বন্ধ ? সে স্তর কবে পার হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা আত্মীয়ের অধিক। বাহিরের বাঁধন নাই বলিয়াই সম্বন্ধটা ভিতরে-ভিতরে এমন পাকা হইয়া উঠিয়াছে, রতনকে এখন বেতন না দিলেও যাইবে না, তাড়াইয়া দিলেও যাইবে না, তাড়াইয়া দিলেও ফিরিয়া আসিবে, এখন সে অন্তরের পরিবারভুক্ত ব্যক্তি! একেই পরকীয় প্রেম বলিতেছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে জৈব আকর্ষণ আছে, সামাজিক দায়িত্ব আছে, ছোটো-বড়ো আরও কত আকর্ষণ আছে। কিন্তু পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে মনিবের সম্বন্ধে সে-সব কিছুই নাই। তবু তাহা এমন আত্মীয়তায় পরিণত হয় কেন ? মনস্তত্ত্বের কোন্ রহস্যময় বীজ এই সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত ? ভৃত্যমাত্রেই পুরাতন ভৃত্যে পরিণত হইয়া রতনের পর্যায়ে প্রোমোশন পাইতে পারে না ; আবার সকল মনিবই সতীশ বা শ্রীকান্ত বা দেবদাস নয়, উভয় পক্ষের সহযোগিতার উপরে এই সম্বন্ধের দায়িত্ব ও মাধুর্য নির্ভর করে।

সংসারে ও সাহিত্যে পুরাতন ভৃত্য ও তাহার চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাতন দাসী কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কী ? নারীর প্রেম স্বামী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর-কাহাকেও কাছে টানিতে পারে না, তাহা একান্তভাবে বস্তুমুখী ; যে অপর, যে দূর, সেই অনির্দিষ্টকে গ্রহণ করিবার শক্তি নারীতে নাই, তাহার প্রেমের চলাচল সংকীর্ণ পথে, বৃহৎ ক্ষেত্রে ব্যাপকরূপে আত্মপ্রকাশের শক্তির তার অভাব, এইজন্যই নারীসমাজের আদর্শ জননী, আদর্শ

পত্নী ও আদর্শ গৃহিণীর অভাব না থাকিলেও আদর্শ পুরাতন দাসী কখনো কদাচিৎ দেখা যায়। পুরুষের প্রেমে যে একটা অকারণ উদারতা ও উদ্দেশ্যহীন আত্ম-বিকিরণের ইচ্ছা আছে— মনিবের প্রতি, এমনকি, অনেক সময়ে অত্যাচারী মনিবের প্রতি পুরাতন ভৃত্যের প্রেম তাহারই একটা প্রকাশ। কিন্তু এই প্রেমটা বিশেষ করিয়া প্রকাশ পায় ভবঘুরে মানবের প্রতি। ভবঘুরের দল এক হিসাবে শিশু। শিশুসন্তানের প্রতি যে আকর্ষণ, শ্রীকান্তের প্রতি সেই আকর্ষণ রতনের; সে একাধারে ভৃত্য, সখা, জননী ও মন্ত্রী। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে পায় নাই, অদৃষ্ট সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছে রতনকে জুটাইয়া দিয়া। হাইফেন যেমন দুটি শব্দকে একাকার না করিয়াও এক করিয়া রাখে, রতনও কি তেমনিভাবে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মধ্যে কাজ করিতেছে না?

সাবিত্রী

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তিনটি প্রধান নারীচরিত্র আঁকিয়াছেন— সাবিত্রী, কিরণময়ী ও সুরবালা। এই তিনজনের সমাবেশে ও তুলনায় নারীচরিত্র সম্বন্ধে, নারীমনের রহস্য সম্বন্ধে লেখকের ধারণা বুঝিতে হইবে। এই তিনজনের মধ্যে সাবিত্রীই প্রধান। উপন্যাসের আদিতেই তাহাকে পাই, অন্ত্য দৃশ্যেও তাহাকে পাই, মধ্যে তো পাই-ই। কাহিনীর আদি, অন্ত ও মধ্য জুড়িয়া সে বিরাজমানা। সাবিত্রী-চরিত্র যেন উপন্যাসখানির স্থায়ীভাব— অপর চরিত্র-দুটি সঞ্চারীভাবের মতো আসা-যাওয়া করিয়া স্থায়ীভাবকে উজ্জ্বলতর, প্রস্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছে।

সাবিত্রী, কিরণময়ী ও সুরবালার অবস্থার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। বালবিধবা সাবিত্রী কুলত্যাগিনী; সদ্যোবিধবা কিরণময়ী পরপুরুষের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করিয়াছে— আর সুরবালা স্বামীপ্রেমে সৌভাগ্যশালিনী আদর্শ পত্নী। সাবিত্রীর দক্ষিণে ও বামে সুরবালা ও কিরণময়ীকে স্থাপন করিয়া, তাহাদের সান্নিধ্যে, তাহাদের তুলনায় সাবিত্রীকে বুঝিতে হইবে।

সুরবালা ও উপেন্দ্র আদর্শ দম্পতি। যতদূর মনে পড়িতেছে, শরৎচন্দ্র এই একটিই আদর্শ দম্পতি-চরিত্র আঁকিয়াছেন। ঐ রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। তাঁহার উপন্যাসের প্রধান নরনারী বিবাহবন্ধনের বাহিরের লোক, যদিচ তাহারা সকলেই বিবাহের হোমাগ্নিকুণ্ডের চারি পাশে মুগ্ধ পতঙ্গের মতো ভ্রাম্যমাণ। সুরবালা-উপেন্দ্র-চরিত্র তাহার ব্যতিক্রম। আদর্শ দাম্পত্য-জীবন কত সার্থক, কত মধুময় হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই দম্পতিটি। বিবাহিত প্রেমের চরম সুরবালা ও উপেন্দ্রের জীবন।

কিরণময়ী যেমন রূপবতী, তেমনি বুদ্ধিমতী। তাহাকে 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' করিয়াই শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন। স্বামীর কাছে সে প্রেম পায় নাই, পাইয়াছে বিদ্যা ; বুদ্ধি তাহার নিজস্ব ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে উপেন্দ্রকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। সুরবালার স্বামীপ্রেম দেখিয়া, সে-বস্তু যে কী বুঝিল। স্বামী জীবিত থাকিলে হয়তো সুরবালার উদাহরণ তাহার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। তাহার স্বামী মরিল। তখন তাহার ক্ষুধিত হৃদয় উপেন্দ্রের দিকে ছুটিল। কিন্তু উপেন্দ্র তো অনঙ্গ ডাক্তার নয়, সে সুরবালার স্বামী। তখন তাহার ব্যর্থপ্রেম বিদ্বেষের আকার ধরিয়া উপেন্দ্রকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসিল। সে উপেন্দ্রের স্নেহপাত্র দিবাকরকে লইয়া আরাকানে চলিয়া গেল। তারপরে উপেন্দ্রের কঠিন ব্যাধির সংবাদ পাইয়া যখন সে ফিরিল, তখনো উপেন্দ্রের প্রতি তাহার প্রেম অবিচল। হতভাগিনী সেই প্রেমের ভার সহিতে না পারিয়া উন্মাদপ্রায়— তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি সব ভাঙিয়া পড়িল, রূপ তো আগেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

সুরবালাতে পাইলাম প্রেমের সার্থকতা, কিরণময়ীতে পাইলাম প্রেমের ব্যর্থতা। সাবিত্রী এ-দুয়ের মাঝামাঝি। তাহার প্রেম সার্থকও নয়, আবার ব্যর্থও নয়। বাহিরের মানদণ্ডের বিচারে তাহার প্রেমের সার্থকতা ও ব্যর্থতা বুঝিবার উপায় নাই। কিংবা বলা উচিত যে, তাহার প্রেম বাহিরের বিচারে ব্যর্থ হইয়াও ভিতরের দিকে সার্থক। সতীশ তাহাকে ভালোবাসে, সেও সতীশকে ভালোবাসে —কিন্তু তাহার বেশি বাহ্য সার্থকতা তাহার ভাগ্যে আর ঘটিল না। নরনারীর প্রেমকে ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ করিলে সাবিত্রীর প্রেম সার্থক। কিন্তু বিবাহের বাহ্য সার্থকতা তাহার হইবার নয়। বরঞ্চ সেই পথের অন্তরায়-সৃষ্টির দায়িত্ব সে

লইতে বাধ্য হইয়াছে। মৃত্যুকালে উপেন্দ্র সরোজিনীর সহিত সতীশের বিবাহ দিবার ভার সাবিত্রীর উপরে দিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পরেও তাহার অশরীরী প্রভাব সক্রিয় হইয়া রহিল। বিবাহিত প্রেমে যে-ব্যক্তি জীবনের চরম সার্থকতার স্বাদ পাইয়াছে, সরোজিনীর সঙ্গে সতীশের বিবাহের নির্দেশ দান করিয়া সতীশ ও সাবিত্রীকে এক মহাসংকট হইতে সে বাঁচাইয়া গেল।

সাবিত্রী কিরণময়ীর মতো বিদুষী নয়, সুরবালার মতো স্বামীপ্রেমে সৌভাগ্যবতীও সে নয়— তবু তাহার চরিত্র সরল, সতেজ ও উন্নত। সে কোন্ শক্তির বলে? তাহাকে মর্যাল ইন্‌স্‌টিংট্ বা সহজাত নৈতিক বোধ বলা যাইতে পারে। ইহাই তাহাকে বহু দুর্গতির সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিয়া সতীশের জীবনক্ষেত্রে আনিয়া দিয়াছে। সতীশকে সে ভালোবাসিয়া ফেলিল। সহজাত নৈতিকবোধের সহিত ভালোবাসা মিলিয়া তাহাকে দুর্জয় করিয়া তুলিল, লোহা ইস্পাতে পরিণত হইল। সাবিত্রীর চরিত্র ইস্পাতের মতো দৃঢ়, নমনীয় এবং তীক্ষ্ণ-ধার। সে-ইস্পাত বিচিত্রকর্মা। দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সতীশকেও সে বারংবার আঘাত করিতে দ্বিধা করে নাই। সরোজিনীর সহিত বিবাহ ঘটাইবার প্রতিশ্রুতিতে ইস্পাতের নমনীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। আর দৃঢ়তা তো আদি-অন্ত-মধ্য সর্বত্র।

ইহার চেয়ে অনেক কম ভারে, অনেক কম পরীক্ষার চাপে কিরণময়ী ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে লোহা মাত্র; দুঃখের ত্যাগে, প্রেমের সংমিশ্রণে ইস্পাত হইবার সুযোগ সে পায় নাই। কিরণময়ীর ভাঙিয়া পড়িবার আসল কারণ, তাহার প্রেম বাহিরে আশ্রয় সন্ধান করিয়াছিল। যাহার আশ্রয় ভিতরে তাহাকে বাহিরে স্থাপন করিতে গেলে এমনি হইবারই আশঙ্কা।

অনেকে সাবিত্রীর সহিত রোহিণীর তুলনা দিয়া শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের পার্থক্য দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তুলনাটা কি সার্থক? সাবিত্রী পতিত, কিন্তু পতিতা নয়; রোহিণী পতিত ও পতিতা দুই-ই; কাজেই তাহাদের পরিণাম একরকম হইতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে আর-একটা ব্যাপক প্রশ্ন করা যাইতে পারে। অনেকে বলেন যে, পতিতা নারীর প্রতি শিল্পী শরৎচন্দ্রের আচরণ সহৃদয়। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী ও চন্দ্রমুখীর দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়া থাকে। তাহারা সবাই পতিত, কিন্তু কেহই

পতিতা নয়। বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও নিষ্ঠায় তাহাদের মাথা সাধারণ নারীদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। এমনকি যে-সুরবালা পাতিব্রত্যের আদর্শ, সাবিত্রী তাহার চেয়ে কোন্ অংশে কম? সাবিত্রীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রের মতো পিউরিট্যানের মতেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহাদের প্রতি যতই করুণাপর হোন-না কেন, বিবাহ-সম্পর্কের মধ্যে ইহাদের টানিয়া আনিতে সাহস পান নাই। তাঁহার ভাবটা যেন, মানবিক মহত্ত্ব ও সামাজিক মর্যাদা ভিন্ন স্তরের বস্তু। একজন লোক মহৎ হইলেও সামাজিক মর্যাদায় ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এ-কথা তিনি স্পষ্টত না বলিলেও সাবিত্রী বলিয়াছে এবং এই অজুহাতেই সে সতীশকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

হিন্দুবিবাহের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটি বিস্ময়জাত শ্রদ্ধার ভাব ছিল— দেখা যাইবে যে, এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রে ও বঙ্কিমচন্দ্রে বিশেষ ভেদ নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ-কথা স্বীকার্য— প্রমাণ নৌকাডুবি, চোখের বালি এবং যোগাযোগ।

কিরণময়ীর সহিত শৈবলিনীর সার্থক তুলনা চলে। দুইজনেই বিবাহে অসুখী, দুইজনেরই জ্ঞানপিপাসু স্বামীর সঙ্গে শিষ্যার সম্বন্ধ। দুইজনেরই মন পরপুরুষ-অভিমুখী। শৈবলিনীর আন্তরিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক দণ্ড ও শেষে উন্মাদ অবস্থার কথা জানি। কিরণময়ীর অবস্থাও কি তদ্রূপ নয়? শৈবলিনীর উন্মাদাবস্থার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যদি দায়ী হন, তবে কিরণময়ীর উন্মাদাবস্থার জন্য কি শরৎচন্দ্র দায়ী নহেন? শৈবলিনীর কামনা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে দূষণীয় হয়, কিরণময়ীর বাসনাকে শরৎচন্দ্রও কি দূষণীয় মনে করেন নাই? নরনারীর লৌকিক প্রেমের আশ্রয় সমাজ ও বিবাহবন্ধন। তদতিরিক্ত প্রেমের আশ্রয় সমাজ নয়, নরনারীর অন্তঃকরণ। সে-প্রেমকে সাবিত্রী যেভাবে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছে সেই-ভাবেই বহন করিতে হইবে— অন্যথা কাহারো কল্যাণ হয় না। ইহা বিশেষ-ভাবে ভারতীয় কথা এবং সমস্ত ভারতীয় লেখকই এই সত্যকে মানিয়া চলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও অন্যথা করেন নাই। ইহা সাহস বা ভীরুতার প্রশ্ন নয়। মানবিক সত্যকে সামাজিক সত্যের সহিত সংগত করিয়া গ্রহণ করিবার ব্যাপার। সমাজ-চৈতন্যের ইহা একটা দৃষ্টান্ত। শিল্পীমাত্রেই সামাজিক শিল্পী। মাটি ছাড়া তৃণ জন্মায় না। ত্রিশঙ্কুর জগতে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নহে।

শরৎচন্দ্রের মহত্ত্ব এই যে, তিনি পতিত নারীর সঙ্গে পতিতা নারীর ভুল

করেন নাই। তাঁহার বাস্তবসম্মত লেখনী পতিত নারীকে সামাজিক মর্যাদায় ফিরাইয়া লইয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের মানবিক মহত্ত্বের উপরেও প্রতিষ্ঠিত করিতে ভোলে নাই। সামাজিক মর্যাদাই একমাত্র মর্যাদা নয়, মানবিক মর্যাদা বলিয়াও একটা বস্তু আছে। তাহার মূল্য অপরটির চেয়ে অল্প নয়। সেই অত্যুচ্চ পীঠস্থানে তিনি পতিত নারীদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন— এখানেই তাঁহার করুণা। মানবিক মহত্ত্বের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর উন্নত ললাট পৌরাণিক সাবিত্রীর প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। খুব সম্ভব লেখকের জ্ঞাতসারেই সাবিত্রী নামের মধ্যে এই রকম একটা ইঙ্গিত বর্তমান।

অচলা

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসখানি তাঁহার অন্যান্য সব উপন্যাস হইতে একটু স্বতন্ত্র পর্যায়ের। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসকে ভগ্নবিবাহ পাত্রপাত্রীর জীবন-কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোনো কারণে— সে-কারণ সামাজিক হইতে পারে, অর্থনৈতিক হইতে পারে— অধিকাংশ সময়েই সামাজিক কারণে, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ ঘটিতে পারে নাই। তারপর আবার তাহাদের দেখা ঘটিয়াছে, অনেক সময়ে সে-দেখা বহু বৎসর পরে ঘটিয়াছে, তখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে-আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিতে থাকে তাহাই শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের উপজীব্য। কদাচিৎ কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। 'গৃহদাহ' সেই ব্যতিক্রম। সেইজন্য গৃহদাহের নায়িকা অচলা তাঁহার অন্যান্য প্রধান নারীচরিত্র হইতে স্বতন্ত্র।

শরৎচন্দ্রের কল্পিত-প্রধান নারীচরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি ও সংস্কারের মধ্যে— দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত তাহারা কখনোই সংস্কারের সীমা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রী যথাক্রমে শ্রীকান্ত ও সতীশকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সে ভালোবাসাকে তাহারা যে বিবাহের সীমা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারে

নাই তাহার কারণ, নিজেদের পূর্বেতিহাসের ছাপ তাহাদের মনের মধ্যে অত্যন্ত সচেতন ছিল। রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রী দুইজনেই আনুষ্ঠানিক হিন্দু, পূজা-অর্চনা লইয়া অনেকটা সময় তাহারা কাটায়। তাহারা জানে যে, তাহারা পতিতা নয়, পতিত মাত্র, কিন্তু সেটাও তাহাদের চক্ষে এতই দূষণীয় যে বিবাহের হোমাগ্নি-সমীপে আসিতে তাহারা সংকুচিতা। প্রবৃত্তি দুর্দম হইলেও, তাহারা আরও প্রবল ; ফলে এখানে সংস্কারেরই জয় হইয়াছে।

বিবাহরূপ সংস্কার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণা এমন দুর্মোঘ যে, যেখানে একবার বিবাহের কথা উঠিয়াছে, যেমন রমা ও রমেশের ক্ষেত্রে— কিংবা ছেলে-খেলাচ্ছলেও বিবাহের অভিনয় হইয়াছে, যেমন শেখর ও ললিতার, যেমন ষোড়শী ও জীবানন্দের, যেমন রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের— লেখক তাহাকে আর লঙ্ঘন করিতে সাহস করেন নাই। যেখানে সম্ভব, শেষপর্যন্ত তাহাদের বিবাহ ঘটিয়াছে— যেমন ললিতা ও শেখরের বেলায়। কিন্তু যেখানে কোনো সামাজিক কারণে বিবাহটা সম্ভব হয় নাই, সেখানেও নরনারী পরস্পরকে মনে-মনে বা নিজেদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু লেখক কখনোই বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠান পর্যন্ত অগ্রসর হন নাই। সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে সংস্কারেরই জয় হইয়াছে— কেবল নারীর মনে মাত্র নয়, লেখকের মনেও বটে।

'দত্তা' উপন্যাসের বিজয়াকে এই নিয়মের আর-একটি ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে পারে— কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। সেখানেও সংস্কারেরই জয়। বিজয়া যখন ঘটনাক্রমে জানিতে পারিল যে তাহার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যেই রাখিয়া গিয়াছেন, অমনি তাহার মন প্রস্তুত হইল। আগে হইতে মনে-মনে সে নরেন্দ্রকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল ; কিন্তু পিতৃ-অভিপ্রায়ের সাহায্য না পাইলে মনঃস্থির করিতে পারিত না। তাহার মনে প্রবৃত্তি ছিল নরেন্দ্রের দিকে, সংস্কার ছিল বিলাসবিহারীর দিকে, সেই সংস্কারের টানেই সে প্রবৃত্তির উজানে চলিতেছিল, এমন সময়ে সংস্কারের হাওয়া ঘুরিয়া গেল, এবং প্রবৃত্তি ও সংস্কার একযোগে নরেন্দ্রের দিকে টান মারিল— রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর সাঁড়াশি-আক্রমণ এড়াইয়া নরেন্দ্রের বামে তাহার পিতৃনির্দিষ্ট আসনে গিয়া সে বসিল।

গৃহদাহে এ-সমস্তর ব্যতিক্রম। প্রথম ব্যতিক্রম— কাহিনীর প্রারম্ভেই মহিম

ও অচলার বিবাহ ঘটিয়াছে। একে তো শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিবাহ প্রায়ই ঘটে না, কখনো কদাচিৎ ঘটিলে প্রায় শেষ মুহূর্তে ঘটে— যেমন 'পরিণীতা'য় এবং 'দত্তা'য়, এ-দুখানির শেষ পাতা-কয়েকটি হোমাগ্নি-উজ্জ্বল, অন্যান্য অনেকগুলির শেষ পাতা-কয়েকটি যেমন চিতাগ্নি-ধূসর। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, সুরেশ ও মহিমের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণে, অর্থাৎ সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে, প্রবৃত্তিই জয়ী হইয়াছে। সে-জয় অল্প আয়াসে হয় নাই এবং অনেক পরিমাণে আকস্মিকভাবে ও ঘটনার চক্রান্তে ঘটিয়াছে সত্য, তবে জয় যে হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবৃত্তির গলায় মালা দিতে বাধ্য হইলেও অচলা সুখী হয় নাই। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে না পাইয়া যে-আনন্দ পাইয়াছিল, সাবিত্রী সতীশকে ত্যাগ করিয়া যে-আনন্দ পাইয়াছিল, সুরেশকে লাভ করিয়া অচলা তাহার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পাইয়াছিল।

সুরেশের সহিত প্রথমরাত্রিতে মিলনের পরে অচলার যে-চিত্র লেখক দেখাইয়াছেন, তাহার গ্লানি ও কালিমা কী অপরিমেয়! 'তাহার মুখ মড়ার মত শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা, এবং কালো পাথরের গা দিয়ে যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।'

প্রবৃত্তির জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু এ কী-রকম জয়? সংস্কারের শেষ-পরিখাশ্রয়ী অচলার মুমূর্ষু দেহের উপরে তাহার পতাকা প্রোথিত। মুমূর্ষ দেহটি ছাড়া বিজয়ী আর কী পাইল? এ-রকম লক্ষ্মীহীন জয়ে বিজয়ীরই কি আনন্দ আছে? অচলা হারিয়া পাঠকের সহানুভূতি জয় করিয়া লইল। বিজয়ীর রহিল শুধু ক্ষতবিক্ষত

অচলার মনে সুরেশের স্থান ছিল না বলিয়াছি, কিন্তু মহিমের স্থান ছিল কি? মহিমের স্থান ছিল না, ছিল স্বামীর স্থান। তবে মহিমে আর স্বামীতে অচলার মনে একাত্ম হইতে পারে নাই, তাই এত অনায়াসে সে-মনের মধ্যে কখনো মহিম কখনো সুরেশ যাতায়াত করিতে পারিয়াছে। অচলার মনে স্বামীর যে-আদর্শ বিরাজ করিতেছিল তাহার সঙ্গে— কি সুরেশ, কি মহিম কাহাকেও অচলা মিলাইয়া লইতে পারে নাই। অচলা স্বামীনিষ্ঠ, এখানে তাহার অচলা নামের সার্থকতা; মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে সে চঞ্চল, তাই সমাজের চোখে সে ভ্রষ্ট।

স্বামী আদর্শে ও পতিরূপে গৃহীত ব্যক্তিতে সাধারণত সহজে মিলিয়া গিয়া অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়— কিন্তু ঘটনাচক্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, অচলার জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। এমন কেন হইল, সে-বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে। বিবাহ-পূর্ব সামাজিক পরিবেশ, বিবাহোত্তর আর্থিক অনটন, সুরেশের বাঁধভাঙা প্রেমনিবেদন, মহিমের অতিসংযত আত্মকেন্দ্রিকতা— সমস্তই অচলাকে দুঃখময় ইতিহাসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। লেখক অচলাকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু তাহার বিশেষ অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি করুণার ধারাও প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। অচলার পরিণামের জন্য তাহার পারিপার্শ্বিকেরই দায়িত্ব বেশি —এ-রকম অবস্থায় অল্প নারীই অচলা থাকিতে পারে, অচলাও পারে নাই।

সুরেশের মৃতদেহ দাহ করিয়া 'মহিম আসিয়া দেখিল, সে কেরোসিনের আলোটা সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, এখন তুমি কি করবে?'

'আমি? বলিয়া অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, শেষে বলিল, আমি তো ভেবে পাই নে। তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই করব।'

অচলার এই 'তুমি' কে? মহিম ভাবিয়াছিল সে নিজে। কিন্তু তাহা সত্য নয়। অচলা অন্তর্নিহিত স্বামীর আদর্শকে সম্ভাষণ করিয়াছিল মাত্র। সে-আদর্শের সহিত মহিমের আত্মতা খুব বেশি নয়। অবশ্য অচলাও জানিত না যে 'তুমি' বলিয়া সে আদর্শগত স্বামীকে সম্ভাষণ করিতেছে; সে দেখিতেছে মহিমকে, অনুভব করিতেছে একটি আদর্শকে। এ-দুয়ে যে মেলে না, ইহা তাহার অগোচর —ইহাতেই তাহার জীবনের ট্রাজেডি।

শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী

দুই উপায়ে সাহিত্যে চরিত্র-পরিকল্পনা চলিতে পারে— সৃষ্টিকার্য আর আবিষ্কার। যাহা ছিল না তাহার বিকাশ সৃষ্টিকার্য, আর যাহা ছিল তাহার প্রকাশ আবিষ্কার। আমেরিকা মহাদেশ ছিল, কলম্বাস নাবিক তাহাকে প্রকাশ করিলেন, কলম্বাস আমেরিকার আবিষ্কর্তা। একবার বিশ্বামিত্র বিধাতার সঙ্গে রেষারেষি করিয়া স্বতন্ত্র একটা পৃথিবী সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। বিশ্বামিত্র ব্যর্থ স্রষ্টা। বিশ্বামিত্রের ব্যর্থতাব কারণ কী? তাহার সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে প্রেম ছিল না। সৃষ্টির জন্য প্রেমের আবশ্যক, যেমন আবশ্যক আবিষ্কারের জন্য জ্ঞানের। কলম্বাস সার্থক আবিষ্কর্তার দৃষ্টান্ত, বিশ্বামিত্র যেমন দৃষ্টান্ত ব্যর্থ স্রষ্টার।

বাস্তব জগতের এই রীতি সাহিত্যজগৎ সম্বন্ধেও সত্য। সেখানেও পূর্বোক্ত দুই উপায়ে চরিত্র-পরিকল্পনা চলিয়া থাকে। কোনো-কোনো লেখক সৃষ্টি করেন, আবার কোনো-কোনো লেখক আবিষ্কার করেন। চরিত্রের সৃষ্টিকার্য দেখিলে বুঝিতে পারি, অমুক ব্যক্তিটি এই প্রথম জন্মগ্রহণ করিল। আর চরিত্রের আবিষ্কারকার্য দেখিলে বুঝিতে পারি, লেখক অমুক ব্যক্তিটিকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। লোকটি চিরকালই ছিল, কেবল আমাদের দৃষ্টি নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন বলিয়া তাহাকে দেখিয়াও দেখি নাই। লেখক সেই সংস্কারমুক্ত, তিনি ইহাকে দেখিয়াছেন আর আমাদের দর্শনযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। লেখকের প্রসাদে 'ছিল যা ভুবনের অন্ধকারে, এল তা জীবনের আলোকপারে।'

এবারে উদাহরণে আসা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সাহিত্যে আবিষ্কারক। তাঁহার অঙ্কিত কালকেতু ও ফুল্লরা আবিষ্কারকার্য। বিশেষ দরিদ্রাবস্থায় তাহাদের যে-চিত্র ফুটিয়াছে তাহা আবিষ্কার ছাড়া আর-কিছুই নহে। রাজা ও রানী হইবার পরে কালকেতু ও ফুল্লরার চরিত্র তেমন বিশ্বাসগ্রাহী হয় নাই, সেটা না আবিষ্কার, না সৃষ্টি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া আবিষ্কাররীতি সফল হইয়াছে ভাঁড়ু দত্তের বেলায়। ভাঁড়ু দত্তই মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-পরিকল্পনা,

আর এ-পরিকল্পনার মূলে আছে মুকুন্দরামের আবিষ্ক্রিয়ার দৃষ্টি। আবিষ্ক্রিয়াই মুকুন্দরামের প্রতিভার বিশেষ ধর্ম।

প্রতিভার সাধর্ম্যে মুকুন্দরামের সহিত শরৎচন্দ্রের তুলনা চলে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ চরিত্র আবিষ্কারধর্ম-সঞ্জাত। 'পথের দাবী'র অনেকগুলি চরিত্র-পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্র নিজের বিশিষ্ট রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর এই কারণেই উপন্যাসখানি রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দুই পর্যায়ের চিত্রই বর্তমান। তাঁহার হীরা-দেবেন্দ্র আবিষ্কার, সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনী সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। তাঁহার মহিম, কৈলাস, পরেশবাবু, কৃষ্ণদয়াল আবিষ্কার; আর গোরা, আনন্দময়ী, সুচরিতা সৃষ্টি।

আবিষ্কারকার্যের জন্য আবশ্যক পর্যবেক্ষণশক্তির, সৃষ্টিকার্যের জন্য আবশ্যক কল্পনাশক্তির। কোনো লেখকে একটা, কোনো লেখকে অপরটা প্রবল। আবার কোনো-কোনো লেখকে দুইটাই প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত পর্যায়-ভুক্ত, মুকুন্দরাম ও শরৎচন্দ্রে পর্যবেক্ষণশক্তি প্রবল।

আগে বলিয়াছি যে, আবিষ্কারের জন্য চাই জ্ঞান, সৃষ্টির জন্য চাই প্রেম; আবার আবিষ্কারের জন্য পর্যবেক্ষণশক্তি, সৃষ্টির জন্য চাই কল্পনাশক্তি। পর্যবেক্ষণ-শক্তির নেত্র জ্ঞান; কল্পনাশক্তির তৃতীয় নেত্র প্রেম। তৃতীয় নেত্রের বিশ্বদর্শনক্ষমতা হইতে নেত্রদ্বয় স্বভাবতই বঞ্চিত।

পরশুরাম-অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্র সাহিত্যে আবিষ্কারকার্য। কাহিনীর পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ, কাহিনীর নরনারী সম্বন্ধে তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তি অতিশয় সূক্ষ্ম। তাঁহার স্বক্ষেত্রে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কতক পরিমাণে পরশুরামের তুলনা করা চলে। প্রভাতকুমার ও ত্রৈলোক্যনাথের পরিধি বিস্তৃততর, তাঁহাদের অঙ্কিত নরনারীর সংখ্যাও প্রচুরতর, সহৃদয়তার ভাবও কিছু বেশি—এ-সবই সত্য। কিন্তু স্বক্ষেত্রে রসোদ্‌বোধনের ক্ষমতায় পরশুরাম তাঁহাদের উপরে। পরশুরামের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, মার্জিত রুচি, সমতার মধ্যে বিষমের আরোপ করিয়া হাস্যোদ্রেকের ক্ষমতা, বাক্যকে মোচড় দিয়া অষ্টাবক্রসৃষ্টির কৌশল, দুরূহ টেকনিক্যাল বিষয়ের শিলাশৃঙ্গ হইতে হাসির ঝরনা বাহির করিয়া আনিয়া

সাধারণের করায়ত্ত করিয়া দিবার নিপুণতা, নীরস আপিস-পাড়ায় হাসির দক্ষিণ-হাওয়া বহাইয়া দিবার দক্ষতা একেবারে অসাধারণ। লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে যে এত আনলিমিটেড হাসির দ্রাবক ছিল, তাহা আগে কে জানিত! আবার সে-হাসিকেও তিনি টানিয়া বাহির করিয়াছেন কলকারখানার শুষ্ক জটাজাল হইতে, নামাইয়া আনিয়াছেন মেমোরাণ্ডাম্, আর্টিকেল্স্, ডেস্ক, লেজার ও ডিরেক্টরদের মিটিঙের দুরূহ দুর্গম দুস্তর শিলাস্তূপ হইতে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তুঙ্গ অট্টালিকাচূড়ায়, পুঞ্জিত আপিস-ফাইলের স্তরে-স্তরে হাসির যে-হিমবাহ স্তম্ভিত হইয়া ছিল, পরশুরামের ইঙ্গিতে তাহারা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, ক্লাইভ স্ট্রীটের খাত বাহিয়া সেই ঝরনা ছুটিয়া আসিয়া মিলিত হইয়াছে সাধারণের জীবনপ্রবাহে। পরশুরাম হাসির ভগীরথ।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের শ্যামবাবু ওরফে শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী পরশুরাম -বিরচিত চরিত্রের টাইপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্যাবসায়িক অসাধুতা আর ধর্মগত কুসংস্কারের উপরেই পরশুরামের কুঠার সবচেয়ে বেশি নির্দয়। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্প এ-দুটি ধারার সংগমস্থলে বিরচিত। মানুষের ধর্মগত কুসংস্কারকে মূলধনরূপে খাটাইয়া ব্যাবসায়িক অসাধুতার চরম দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গের ঘনীভূত ক্ষীর। কোম্পানির নাম 'ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন্-ল, জেনারেল মার্চেন্টস'। এক দিকে ব্রহ্মচারী, অপর দিকে জেনারেল মার্চেন্টস— আর দুইকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ব্রাদার-ইন্-ল। ব্রাদার-ইন্-ল ছাড়া আর কাহারো পক্ষে এই দুয়ের সংযোগ-স্থাপন সম্ভব নহে। এ-বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিলে শব্দটার বাংলায় অনুবাদ করিয়া লইলেই চলিবে।

এ-যুগে ব্যাবসায়িক অসাধুতা, আর ধর্মীয় কুসংস্কাররূপ রিপু— দুটাই সবচেয়ে প্রবল। একদিকে অমিত ধনলোভ দেখা দিয়াছে, অন্য দিকে পরকালের লোভটাও ছাড়িতে পারা যায় নাই, এমত সময়ে এমত সমাজে এই দুই রিপুর তাড়নায় সমস্ত সংসারটাই একটা সুবৃহৎ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হইয়াছে, আর দলে-দলে শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী গেরুয়া ব্যাগ ও ফোঁটাকাটা ললাট লইয়া অপরের ললাটে লালবাতির শিখাটি জ্বালাইয়া দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিরিঞ্চি বাবা ভণ্ড সাধু সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার ভণ্ডামি

ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্যামবাবুর ভণ্ডামি শেষ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। বিরিঞ্চি বাবা ভণ্ডামির পরীক্ষায় ফেল পড়িয়াছে, কিন্তু ভণ্ডামিটাকে শ্যামবাবু এমনি পরিপাক করিয়াছে যে, এক-একবার মনে হয় বুঝি-বা সে সাধু! শ্যামবাবু ভণ্ডামির নীলকণ্ঠ। সেইজন্যই সে আরও ভয়ানক।

শ্যামবাবুকে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেন কতকগুলি চরিত্রকে আবিষ্কারকার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। শ্যামবাবুর মতো লোকেরা স্বয়ম্ভূ এবং ইতস্ততসঞ্চরণশীল। আমরা তাহাদের দেখিয়াও দেখি না, একপাত্রে অর্থ ও পরমার্থ লাভ করিবার আশায় ব্রাদার-ইন্-ল-প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ার কিনিয়া থাকি! পরশুরাম তাহাকে আমাদের হইয়া দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। তাঁহার দেখার সূত্রে, বোঝার সূত্রে মনে হয়— তাই তো, লোকটাকে সেদিন আপিসপাড়ায় দেখিয়াছিলাম বটে! আবার মনে পড়ে, বছর-দুই আগে লোকটা কিছু শেয়ার বেচিয়া গিয়াছিল বটে! তখনি মনে পড়ে —সর্বনাশ! লোকটা অতি ভয়ানক! মনে-মনে তাঁহার বিরুদ্ধে দরজা আঁটিয়া দিই। লেখক আমাদের হইয়া প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই প্রতিভায় আবিষ্কারকার্য! পরশুরাম-অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্র সম্বন্ধেই এই সত্য প্রযোজ্য।